৫

বাংলায় বংশানুক্রমিক শাসন

অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালে বাংলার বংশানুক্রমিক শাসন এই ইউনিটের বিষয়। শশাঙ্ক পরবর্তী শতকে বাংলার 'মাৎস্যন্যায়ম্' যার অবসান ঘটিয়ে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পাল বংশের শাসন। প্রথম তিনটি পাঠে আলোচিত হয়েছে দীর্ঘ চার শতাব্দীকাল ধরে বিরাজমান পাল বংশের শাসনের তিনটি পর্যায়। ধর্মপাল ও দেবপালের উদীয়মান প্রতিপত্তি, প্রথম মহীপালের পূর্বে পাল সাম্রাজ্যের অবনতি ও মহীপাল কর্তৃক পুনরুদ্ধার, দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে সংঘটিত সামন্তবিদ্রোহের ফলে বরেন্দ্র অঞ্চলে পালদের ক্ষমতার অবসান এবং রামপাল কর্তৃক বরেন্দ্র পুনরুদ্ধার আলোচনা করে পাল শাসনের মুখ্য বিষয়সমূহ তুলে ধরা হয়েছে। পাল যুগের সামগ্রিক মূল্যায়ন ও কৃতিত্বসমূহ বিশ্লেষণ করে পাল যুগের গৌরব আলোচনা করা হয়েছে চতুর্থ পাঠে।

পালদের প্রায় সমসাময়িককালে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় (বঙ্গে ও সমতটে) পৃথক রাজনৈতিক সত্তার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই অঞ্চলের প্রধান দুটি রাজবংশের (দেব ও চন্দ্র) শাসন স্থান পেয়েছে পঞ্চম পাঠে। এই ইউনিটের শেষ পাঠে স্থান পেয়েছে বাংলায় সেন বংশের শাসন।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে ঃ

- পাঠ-১. পাল বংশের উত্থান ঃ উদীয়মান প্রতিপত্তির যুগ
- পাঠ-২. পাল সাম্রাজ্য ঃ অবনতি ও পুনরুদ্ধার
- পাঠ-৩. পাল সাম্রাজ্য ঃ অবনতি, পুনরুদ্ধার ও বিলুপ্তি
- পাঠ-৪. পাল যুগের গৌরব
- পাঠ-৫. দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা ঃ দেব ও চন্দ্রশাসন
- পাঠ-৬. বাংলায় সেন শাসন।

পাঠ - ১

পাল বংশের উত্থান : উদীয়মান প্রতিপত্তির যুগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- 'মাৎস্যন্যায়ম্' সম্পর্কে ধারণা পাবেন ;
- গোপালের উত্থান ও বংশ পরিচয় সম্পর্কে জানবেন ;
- পালদের 'উদীয়মান প্রতিপত্তির যুগ' সম্পর্কে জানতে পারবেন ;
- ধর্মপালের 'ত্রিপক্ষীয় সংঘর্ষ' ও সাফল্য সম্পর্কে অবহিত হবেন এবং
- দেবপালের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মাৎস্যন্যায়ম্

শশাঙ্কের রাজত্বের পরবর্তী প্রায় একশ' বছর বাংলার ইতিহাস অনেকাংশেই অন্ধকারাচ্ছন্ন। তথ্যের অভাবে এ সময় অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি হতে অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস রচনা করা কঠিন। হিউয়েন সাং (আনুমানিক ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে)-এর বর্ণনায় কজঙ্গল, পুন্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, সমতট ও তাম্রলিপ্তি -এই পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের উল্লেখ আছে। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প গ্রন্থেও উল্লেখ আছে যে, শশাঙ্কের মৃত্যুর পর অন্ত:বিদ্রোহের ফলে গৌড়রাষ্ট্র ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। নিধনপুর তাম্রশাসনের ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তাঁর বিরোধী মিত্র শক্তিদ্বয় (হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মণ) তাঁর সাম্রাজ্য নিজেদের রাজ্যভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। আশরাফপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনসমূহে জানা যায়, অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাংলায় পরবর্তী গুপ্তবংশ ও খড়গবংশ নামে দুটি রাজবংশের উদ্ভব ঘটে। কিন্তু কোন রাজবংশই বেশিদিন নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে পারেনি।

অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা যে একের পর এক বৈদেশিক আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য বৈদেশিক শক্তিগুলো হলো– উত্তর ভারতীয় শৈল বংশ, কান্যকুব্জের রাজা যশোবর্ম, কাশ্মিররাজ ললিতাদিত্য, ভগদত্ত বংশীয় কামরূপরাজ শ্রীহর্ষ প্রমুখ। এসব বিদেশী শত্রুর উপর্যুপরি আক্রমণে বাংলার রাজনৈতিক ভারসাম্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এর ফলে তৎকালীন বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক অস্থির অবস্থার সৃষ্টি হয়। মহাস্থানগড়ের বৈরাগী ভিটায় খননে পাল ও গুপ্তযুগের অন্তবর্তী স্তরে স্তুপাকার ধ্বংসাবশেষ এই অস্থির অবস্থারই সাক্ষ্য বহন করে।

সুতরাং বলা যায়, শশাঙ্কের পরবর্তী প্রায় একশত বছর বাংলার রাজনীতিতে অস্থির অবস্থা বিরাজমান ছিল। ফলে, এই দীর্ঘ সময়ে এখানে কোন স্থায়ী শাসন গড়ে ওঠার সুযোগ হয়নি। অভ্যন্তরীণ গোলযোগের পাশাপাশি বৈদেশিক আক্রমণের ফলে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা আরো বেড়ে যায়। এই অরাজকতাকেই পাল তাম্রশাসনে "মাৎস্যন্যায়ম্" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে মাৎস্যন্যায় অবস্থার এরূপ ব্যাখ্যা রয়েছে; দন্ডধরের অভাবে যখন বলবান দুর্বলকে গ্রাস করে। অর্থাৎ মাছের রাজত্বের মতো, যেখানে বড় মাছ ছোট মাছকে ভক্ষণ করে। প্রায় শত বছরের অনৈক্য, আত্মকলহ ও বহি:শত্রুর পুন:পুন: আক্রমণের ফলে বাংলার শাসনব্যবস্থা প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়। ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে লামা তারনাথ তৎকালীন বাংলার যে বিবরণ দেন তা হতে এই মাৎস্যন্যায় অবস্থার

পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে উল্লেখ আছে যে, সমগ্র দেশে কোন রাজা ছিল না। প্রত্যেক ক্ষত্রিয় সম্ভ্রান্ত লোক, ব্রাহ্মণ এবং বণিক নিজ নিজ গৃহে ও আশেপাশের এলাকায় স্বাধীনভাবে শাসন করতো।

গোপালের উত্থান ও পালবংশের প্রতিষ্ঠা

শশাঙ্ক পরবর্তী বাংলায় অরাজকতার যুগের অবসান ঘটিয়ে গোপাল বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং পালবংশের শাসনের সূচনা করেন। গোপালের ক্ষমতা লাভ সম্বন্ধে খালিমপুর তাম্রশাসন থেকে জানা যায়। সেখানে বলা হয়েছে –তাঁর ছেলে শ্রীগোপালকে, যিনি রাজাদের মধ্যে মুকুটমণি ছিলেন, মাৎস্যন্যায়ের অবসান ঘটানোর জন্যে প্রকৃতিগণ লক্ষ্মীর হাত গ্রহণ করিয়েছিল।তারনাথ গোপালের উত্থান সম্বন্ধে এক কাহিনীর অবতারণা করেন। তাঁর কাহিনীর সারকথা হল, বহুদিন ধরে অরাজকতা চলায় বাংলার জনগণের দু:খ কষ্টের সীমা ছিল না। দেশের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সবাই মিলে আইনানুগ শাসন প্রতিষ্ঠা করতে একজন রাজা নির্বাচিত করেন। কিন্তু সেই রাজা রাতে এক নাগ রাক্ষুসী কর্তৃক নিহত হয়। এরপর প্রতি রাতে একজন করে নির্বাচিত রাজা নিহত হতে থাকে। এভাবে কয়েক বছর পার হয়ে যাবার পর একদিন চুন্ডাদেবীর এক ভক্ত এক বাড়িতে আসে। ঐ বাড়ির এক ছেলের ওপর ঐ দিন নির্বাচিত রাজা হওয়ার ভার পড়ায় বাড়ির সকলে খুব বিষণ্ন ছিল। আগন্তুক ঐ ছেলের পরিবর্তে স্বেচ্ছায় রাজা নির্বাচিত হন। রাজা হিসেবে বহাল থাকেন। এক রাতে নাগ রাক্ষুসী আসলে তিনি চুন্ডাদেবীর মহিমাযুক্ত এক লাঠি দিয়ে আঘাত করলে রাক্ষুসী মরে যায়। পরের দিন তাঁকে জীবিত দেখে সবাই অবাক হয়। এভাবে পরপর সাতদিন তিনি রাজা নির্বাচিত হন। এরপর জনগণ তাঁকে স্থায়ী রাজারূপে নির্বাচিত করে এবং তাঁকে গোপাল নাম দেয়া হয়।

খালিমপুর তাম্রশাসন ও তারনাথের কাহিনীর ওপর নির্ভর করে অধিকাংশ ঐতিহাসিক গোপালকে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত রাজা বলে মনে করেন। তারনাথের কাহিনীতে রূপক ছলে কিছু ঐতিহাসিক সত্য থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু আক্ষরিকভাবে এই কাহিনীর ওপর বিশ্বাস করে কোন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ঠিক হবে না। ঐতিহাসিকগণ তাই সমর্থন খোঁজেন খালিমপুর তাম্রশাসনে। সেখানে বলা হয়েছে, মাৎস্যন্যায় অবস্থার অবসান ঘটাতে প্রকৃতিগণ গোপালকে রাজ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে। প্রকৃতি শব্দ বলতে বিশেষ অর্থে "জনগণ" বা "প্রধান কর্মচারী" বুঝায়। কিন্তু অষ্টম শতাব্দীতে অরাজকতাপূর্ণ অবস্থায় জনগণের একমত হয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। কিংবা সে সময় কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে প্রধান কর্মচারীগণেরও নির্বাচন করার প্রশ্ন ওঠে না। সুতরাং দেখা যায় খালিমপুর তাম্রশাসনে ব্যবহৃত 'প্রকৃতি' শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করা সহজ নয়। এই 'প্রকৃতির' অন্য রকম ব্যাখ্যা করা সম্ভব। গোপাল হয়ত কয়েকজন 'প্রকৃতির' (নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বা কর্মচারী যারা তাঁর অনুগামী ছিল) সাহায্যে ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর সাফল্যই অরাজকতার অবসান ঘটিয়েছিল।সভাকবি এই ঘটনাই পরোক্ষভাবে প্রকাশ করে খালিমপুর তাম্রশাসনে।ঐতিহাসিকগণ নির্বাচনের পক্ষে ব্যাখ্যা করেন তারনাথের কাহিনী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে।তারনাথের কাহিনীর অন্তর্নিহিত অর্থ এটিও হতে পারে যে, গোপাল অরাজকতা সৃষ্টিকারী শক্তিকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন, এই সাফল্যই তাঁকে ক্ষমতাসীন করেছিল এবং তাঁর সমর্থন সৃষ্টি করেছিল। তারনাথের কাহিনীর এই অর্থ খালিমপুর তাম্রশাসনের শ্লোক এবং শ্লোকের ভিত্তিতে যে ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হয়েছে তাতে খুব একটা অসঙ্গতি নেই। সুতরাং গোপাল একজন সমর নেতা হিসেবে কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সহায়তায় অরাজকতার অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করে ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন। অষ্টম শতাব্দীতে গণ নির্বাচনের কথা চিন্তা করা যায় না। তাছাড়া নির্বাচন ঘটে থাকলে পাল তাম্রশাসনগুলোতে প্রাপ্ত প্রশস্তিসমূহে এ বিষয়ে আরো স্পষ্ট উল্লেখ থাকতো।

গোপালের বংশ পরিচয়

গাপালের বংশ পরিচয় সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। একমাত্র খালিমপুর তাম্রশাসনে গোপালের পিতা বপ্যট (যিনি শত্রু ধ্বংসকারী ছিলেন) এবং পিতামহ দয়িতবিষ্ণুর (যাকে সর্ববিদ্যা বিশুদ্ধ বলা হয়েছে) উল্লেখ আছে। এ থেকে বলা যায়, গোপালের পিতা বপ্যট যুদ্ধে পারদর্শী ছিলেন। তবে পরবর্তী পাল রাজাগণ তাঁদের তাম্রশাসনে গোপালের পিতা বা পিতামহের কথা আর উল্লেখ করেননি।

গোপালের রাজত্বকাল সম্পর্কে সঠিকভাবে জানার উপায় নেই। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে উল্লেখ আছে যে, তিনি ২৭ বছর রাজত্ব করেন। অনুমান করা হয় গোপাল ৭৫৬ হতে ৭৮১ খিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।

পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল সম্বন্ধে তথ্যের অভাব থাকায় বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। বাংলায় অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে নতুন এক রাজশক্তি প্রতিষ্ঠাই তাঁর প্রধান কীর্তি। গোপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পাল রাজবংশের শাসন বাংলায় প্রায় চারশ' বছর স্থায়ী হয়েছিল।

বাংলায় পাল শাসন

গোপালের উত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয় পাল রাজবংশ। প্রায় চারশত বছর ধরে ১৭ জন পাল নৃপতি বাংলা শাসন করেন। এই সুদীর্ঘ শাসনকালে এই বংশের ইতিহাসে বিভিন্ন ভাগ্য পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। উত্থান ও পতনের ক্রমধারায় পাল রাজত্বকালকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়কে উদীয়মান প্রতিপত্তির যুগ বলে আখ্যায়িত করা যায়।এ যুগের মধ্যে ছিল ধর্মপাল ও দেবপালের রাজত্বকাল। এরপর পাল রাজবংশে উৎসাহ ও উদ্যোগের অভাব দেখা যায় এবং শুরু হয় সাম্রাজ্যের অবনতি। এই অবস্থার উন্নতি সাধন করে সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের সাফল্য দেখান প্রথম মহীপাল। তাই দ্বিতীয় পর্যায়ের নামকরণ করা যায় অবনতি ও পুনরুদ্ধারের পর্যায়। কিন্তু মহীপাল কর্তৃক পাল সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারকার্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। অভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণে সাম্রাজ্য বিপদের সম্মুখীন হয়। রামপাল সাম্রাজ্যকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন বটে, কিন্তু রামপালের পর পাল বংশীয় শাসন বেশি দিন টিকে থাকেনি। তাই তৃতীয় পর্যায়কে অবনতি ও বিলুপ্তির পর্যায় বলে ধরা যায়।

উদীয়মান প্রতিপত্তির যুগ

গোপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শাসনের ওপর ভিত্তি করে তাঁর পরবর্তী দুই উত্তরাধিকারী ধর্মপাল ও দেবপাল পাল সাম্রাজ্যকে উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত করতে সক্ষম হন। ধর্মপাল ও দেবপালের নেতৃত্বে বাংলা ও বিহারে পাল সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এমনকি উত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ রাখার মত শক্তি অর্জন করে। তাই পাল সাম্রাজ্যের প্রথম পর্যায়কে 'উদীয়মান প্রতিপত্তির যুগ' বলে আখ্যায়িত করা হয়। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সাহিত্যিক উপাদানের অভাবে এ সময়ের বাংলার ইতিহাসের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো বিভিন্ন লিপিমালা। সৌভাগ্যের বিষয় যে, পাল রাজাদের অনেকগুলো তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব তাম্রশাসনে ভূমিদান সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় আদেশাবলি লিপিবদ্ধ করার আগে প্রায় সবক্ষেত্রেই একটি প্রশস্তি রয়েছে। পাল রাজাদের কৃতিত্ব ও সাফল্য এই প্রশস্তির বিষয়বস্তু। সভাকবি কর্তৃক রচিত হওয়ায় এ প্রশস্তিতে অতিরঞ্জন রয়েছে।তাই অন্য কোন সূত্রে সমর্থন ব্যতিত প্রশস্তিতে উল্লেখিত সব তথ্য ঐতিহাসিক সত্য বলে মনে করা উচিত হবে না।সুতরাং এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হতে ইতিহাস পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিককে সবসময়ই অতিরঞ্জনের প্রতি সজাগ থাকতে হবে।

ধর্মপাল

গোপালের পর তাঁর পুত্র ধর্মপাল বাংলার সিংহাসনে বসেন। খালিমপুর তাম্রশাসন ধর্মপালের বিজয়রাজ্যের ৩২ সম্বৎসরে লিখিত। সুতরাং ৩৫/৪০ বছর তিনি রাজত্ব করেন (অনুমান করা হয়), সে হিসেবে তাঁর

রাজত্বকাল ৭৮১ খ্রিস্টাব্দ হতে ৮২১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নির্দিষ্ট করা যায়। পাল সাম্রাজ্যের উত্থান ও এর প্রতিপত্তি বিস্তারে ধর্মপালের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে তাই তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন। গোপাল বাংলা ও বিহারে পাল শাসন দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে যাওয়ায় ধর্মপাল উত্তর ভারতের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার মতো নিজেকে শক্তিশালী মনে করেন। তাছাড়া উত্তর ভারতের সমসাময়িক অবস্থা ধর্মপালকে সাম্রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হতে ও আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করতে সহায়তা করেছিল।

ত্রিপক্ষীয় সংঘর্ষ

পাল বংশ যে সময়ে বাংলা ও বিহারে তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। সেসময়ে উত্তর ভারতের মধ্যস্থলে তেমন কোন প্রভাবশালী শক্তি ছিল না।আর্যাবর্তের কেন্দ্রস্থল কান্যকুব্জে তখন রাজনৈতিক শূন্যতা বিরাজ করছিল।এই রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণের জন্য অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগ হতে প্রায় তিন পুরুষ ধরে পার্শ্ববর্তী শক্তিবর্গের মধ্যে প্রচন্ড উৎসাহ ও প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়।মালব ও রাজস্থানের গুর্জর ও প্রতীহার, দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট রাজাগণ এবং বাংলার পাল রাজাগণ প্রায় একই সময়ে মধ্যদেশে অধিকার বিস্তারে প্রয়াসী হন। ফলে এক ত্রিপক্ষীয় সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে এটিই 'ত্রিপক্ষীয় সংঘর্ষ' নামে পরিচিত।

অষ্টম শতাব্দীর শেষ দিকে ত্রিপক্ষীয় সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।অনুমান করা হয় ৭৯০ খ্রিস্টাব্দ বা নিকটবর্তীকালে ত্রিপক্ষীয় সংঘর্ষের প্রথম পর্যায় সংঘটিত হয়েছিল। এই পর্যায়ের সূত্রপাত হয় প্রতিহার ও পাল সংঘর্ষে। ধর্মপাল যে সময়ে পশ্চিম দিকে বিজয়াভিযান করেন, সে সময়ে প্রতীহার রাজা বৎসরাজও মধ্যদেশে সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টায় পূর্বদিকে অগ্রসর হন। ফলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। এ যুদ্ধে ধর্মপাল পরাজিত হন। কিন্তু বৎসরাজ মধ্যদেশে অধিকার বিস্তারের আগেই তৃতীয় শক্তির আবির্ভাব ঘটে। দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট রাজা ধ্রুবধারাবর্ষ এ সময় আর্যাবর্তে বিজয়াভিযানে আসেন।তিনি বৎসরাজকে পরাজিত করে ধর্মপালের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। রাষ্ট্রকূট সূত্র হতে জানা যায় যে, ধ্রুব গৌড়রাজকে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে পরাজিত করেন। এই তথ্য থেকে ধারণা করা যায় যে, ধর্মপাল বারাণসী ও প্রয়াগ জয় করে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিলেন।এই রাজ্য বিস্তারের গতি অব্যাহত রেখে তিনি মধ্যদেশের দিকে অগ্রসর হন এবং ত্রিপক্ষীয় সংঘর্ষে লিপ্ত হন।

ত্রিপক্ষীয় সংঘর্ষের প্রথম পর্যায়ে ধর্মপাল উভয় শক্তির কাছে পরাজিত হলেও তাঁর তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। কারণ ধ্রুব তাঁর বিজয় সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা না করেই দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্তন করেন।এতে ধর্মপাল পরাজিত হয়েও ক্ষমতা বিস্তারের সুযোগ পান।এর কারণ খুব সহজেই অনুমান করা যায় যে বৎসরাজের পরাজয়ের পর প্রতীহারদের পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করতে বেশ কিছু সময় লেগেছিল।তাই ধ্রুবের প্রত্যাবর্তনের পর ধর্মপাল প্রায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ই নিজ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ধর্মপাল কান্যকুব্জে তাঁর প্রতিনিধি বসাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর প্রমাণ রয়েছে নারায়ণপালের ভাগলপুর তাম্রলিপির একটি শ্লোকে। সেখানে বলা হয়েছে যে, ধর্মপাল ইন্দ্ররাজকে (ইন্দ্রায়ুধ) পরাজিত করে মহোদয় (কান্যকুব্জ) অধিকার করেন এবং চক্রায়ুধকে শাসনভার অর্পণ করেন। ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রলিপিতে এই ঘটনার সমর্থন পাওয়া যায়। সেখানে উল্লেখ আছে ঃ 'তিনি মনোহর ভ্রুভঙ্গী বিকাশে (চোখের ইঙ্গিত দ্বারা) কান্যকুব্জে রাজ অভিষেক সম্পন্ন করেছিলেন; ভোজ, মৎস্য, মদ্র কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গান্ধার এবং কীর প্রভৃতি রাজ্যের নরপালগণ প্রণতিপরায়ণ চঞ্চলাবনত মস্তকে সাধু সাধু বলে এর সমর্থন করেছিল, এবং হৃষ্টচিত্তে পাঞ্চালদেশের বৃদ্ধগণ কর্তৃক তাঁর অভিষেকের স্বর্ণকলস উদ্ধৃত করেছিলেন।' এই শ্লোকের ওপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিকগণ মত পোষণ করেন যে, এই শ্লোকে উল্লেখিত সকল নরপতিকে ধর্মপাল পরাজিত করেন এবং প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত পদানত করেন। শ্লোকে উল্লেখিত প্রায় সবকটি দেশেরই অবস্থান নির্দিষ্ট করা সম্ভব– গান্ধার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও পাঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিমাংশ, মদ্র মধ্য পাঞ্জাব, কীর উত্তর পাঞ্জাব,

কুরু পূর্ব পাঞ্জাব, অবন্তি মালবে, মৎস্য আলওয়ার ও জয়পুর, যবন ও ভোজ বেরার, যদু পাঞ্জাব বা সুরাটে অবস্থিত। যবন সিন্ধুনদের তীরবর্তী কোন মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল।গান্ধার ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এবং কীর হিমালয়ের পাদদেশের অঞ্চল। এই রাজ্যসমূহের অবস্থিতি প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত জয়ের কথাই ঘোষণা করে।দেবপালের মুঙ্গের তাম্রলিপির সপ্তম শ্লোকেও এ ধরনের রাজ্যজয়ের প্রমাণ রয়েছে।এ শ্লোকে বলা হয়েছে যে, ধর্মপাল দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হয়ে কেদার (হিমালয়ে অবস্থিত) ও গোকর্ণ (বোম্বাই কিংবা নেপালে অবস্থিত) এই দুই তীর্থ এবং গঙ্গাসাগর সঙ্গম দর্শন করেছিলেন।

ওপরের উল্লেখিত শ্লোকদ্বয়ে ধর্মপালের রাজ্য জয়ের যে বিবরণ রয়েছে তার ভিত্তিতে বলা যায় যে, ধর্মপাল পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে রাজ্য বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু এ ধরনের প্রশস্তিমূলক উক্তির সমর্থনে অন্য কোন প্রমাণ পাওয়া না যাওয়ায় এ ধরনের উক্তির সামগ্রিক সত্যতা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবে ত্রিপক্ষীয় সংঘর্ষের প্রথম পর্যায়ের পর ধর্মপাল রাজ্য বিস্তারে কিছু সাফল্য নিশ্চয়ই অর্জন করেছিলেন।তিনি কান্যকুব্জ অধিকার করে স্বীয় প্রতিনিধি চক্রায়ুধকে সেখানে অধিষ্ঠিত করেছিলেন সে বিষয়ে তেমন কোন সন্দেহ নেই। কারণ রাষ্ট্রকূট ও প্রতীহার উৎসসমূহে এর সমর্থন পাওয়া যায়। তাঁর এই সাফল্য লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে সভাকবি স্বভাবতই কিছুটা অতিরঞ্জনে লিপ্ত হন এবং পশ্চিমাঞ্চলের যে ক'টি দেশের নাম তাঁর জানা ছিল কিংবা যে ক'টি দেশের নাম কবিতার ছন্দে মিলে, তাদের উল্লেখ করেছেন। যদি সত্যিই কান্যকুব্জে বিভিন্ন রাজন্যবর্গের সমাগম ঘটে থাকে তাহলে, এমনও হতে পারে যে, কান্যকুব্জের সাথে যেসব রাজ্যের সম্পর্ক ছিল সেসব রাজাগণ কান্যকুব্জের পরিবর্তনের সময় সেই অভিষেক সভায় উপস্থিত ছিলেন।তাছাড়া কূটনৈতিক কারণেও তারা সেখানে উপস্থিত থাকতে পারেন। মুঙ্গের লিপিতে কেদার ও গোকর্ণের উল্লেখও খুব স্বাভাবিক। কারণ দুটিই সমসাময়িককালের সুপরিচিত তীর্থস্থান এবং সভাকবি এ স্থান দুটিরও উল্লেখ করেছেন।

ওপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা চলে যে, ধর্মপাল কান্যকুব্জে প্রভুত্ব বিস্তার করে নিজ প্রতিনিধিত্ব অধিষ্ঠিত করেছিলেন। তাম্রলিপির প্রশস্তিতে যে অন্যান্য রাজন্যবর্গের উল্লেখ রয়েছে তা কতটুকু সত্য বা কল্পনাপ্রসূত তা বলা কঠিন।প্রশস্তিতে কিছু অত্যুক্তি থাকা খুবই স্বাভাবিক।তাছাড়া কান্যকুব্জে সাফল্যও বাংলার ইতিহাসে কম গৌরবের কথা নয়। মধ্যদেশে বাংলার নরপতির এটি সম্ভবত প্রথম ক্ষমতা বিস্তার। সুতরাং সেই গৌরবের জন্য ধর্মপাল অবশ্যই কৃতিত্বের দাবিদার।

কান্যকুব্জে ধর্মপালের আধিপত্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। প্রতীহার রাজা বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট্ট নতুন মৈত্রীর মাধ্যমে আবার স্বীয় রাজ্যের শক্তি বাড়াতে সক্ষম হন। প্রতীহার উৎসে দাবি করা হয়েছে, দ্বিতীয় নাগভট্ট চক্রায়ুধকে পরাজিত করেন। গোয়ালিয়র প্রশস্তি হতে জানা যায় যে, ধর্মপালের বিপুল সামরিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও নাগভট্ট তাঁকে পরাজিত করতে সক্ষম হন। অন্য এক লিপিতে উল্লেখ রয়েছে যে, এই যুদ্ধ মুঙ্গের (পাল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে) বা নিকটবর্তী কোন স্থানে সংঘটিত হয়েছিল। এতে এটি স্পষ্ট হয় যে, নাগভট্ট পশ্চাদ্ধাবমান চক্রায়ুধকে অনুসরণ করে মুঙ্গের পর্যন্ত এসেছিলেন।অন্যদিকে চক্রায়ুধ খুব স্বাভাবিক কারণেই তাঁর অধিকর্তার নিকট আশ্রয় পাওয়ার জন্য পাল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলের দিকে এসেছিলেন। কিন্তু এরপরও প্রতীহার রাজ মধ্যভারতে ক্ষমতা বিস্তারে ব্যর্থ হন। কেননা, এ সময় রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ উত্তর ভারতে আগমন করেন নাগভট্টকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। নাগভট্টের পরাজয়ের পর ধর্মপাল ও চক্রায়ুধ উভয়েই স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রকূটরাজের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এ থেকে মনে করা যায় যে, গোবিন্দ ধর্মপালের আহ্বানেই উত্তর ভারত এসেছিলেন। তবে এ বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই। পিতার ন্যায় গোবিন্দকেও দাক্ষিণাত্য ফিরে যেতে (আনুমানিক ৮০১ খ্রিস্টাব্দে) হয়েছিল।

গোবিন্দের প্রত্যাবর্তনের পর কান্যকুব্জের অবস্থা কি হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব নয়। এমনও হতে পারে যে, ধর্মপাল আবার সেখানে তাঁর প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। তবে প্রমাণের অভাবে একথাও তেমন জোর দিয়ে বলা যায় না। তবে ৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে কান্যকুব্জ হতে প্রতীহার রাজ ভোজের লিপি প্রকাশিত হয়। সুতরাং বলা যায় ৮০১ খ্রিস্টাব্দ হতে ৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে কান্যকুব্জ

প্রতীহারদের হাতে যায় এবং ভোজ মধ্যদেশে প্রতীহার সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। অন্যদিকে দেবপালের মুঙ্গের তাম্রশাসন হতে জানা যায় যে, দেবপালের সিংহাসন আরোহণকালে রাজ্যে কোন প্রকার বিপদ ছিল না। অর্থাৎ গোবিন্দের প্রত্যাবর্তনের পর ধর্মপাল আর কোন বিপদের সম্মুখীন হননি বলেই মনে করা হয়।

ধর্মপালের সাফল্য

ওপরের আলোচনা হতে দেখা যায় যে, ত্রিপক্ষীয় সংঘর্ষের উভয় পর্যায়েই ধর্মপাল খুব একটা কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেননি। তবে দুই পর্যায়ের মধ্যবর্তী সময়ে ধর্মপাল পাল সাম্রাজ্যের সীমা পশ্চিম দিকে বেশ কিছুদূর বাড়াতে সক্ষম হন এবং কান্যকুব্জে নিজ প্রতিনিধি বসান। এ সময় তাঁর অধীনে বাংলা সর্বপ্রথম উত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে স্বল্পকালের জন্য হলেও কিছু সাফল্য অর্জন করেছিল। এই সাফল্যকে প্রকাশ করতে গিয়ে পাল সভাকবিগণ তাঁর প্রশস্তি রচনায় স্বাভাবিকভাবেই কিছু অতিরঞ্জন করেছেন। তথাপি ধর্মপালের অধীনে বাংলার নতুন শক্তি ও উদ্দীপনার পরিচয় এই প্রশস্তিসমূহেই পাওয়া যায়।

পাল রাজাদের মধ্যে ধর্মপালই প্রথম সর্বোচ্চ সার্বভৌম উপাধি পরমেশ্বর, পরমভট্টারক ও মহারাজাধিরাজ গ্রহণ করেন। পিতার ন্যায় তিনিও বৌদ্ধ ছিলেন। বরেন্দ্র অঞ্চলের সোমপুর নামক স্থানে (বর্তমান নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে) একটি বিহার বা বৌদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন যা সোমপুর মহাবিহার নামে পরিচিত। খুব সম্ভবত এটি সমগ্র ভারতবর্ষে সর্ববৃহৎ বৌদ্ধ বিহার। ভাগলপুরের ২৪ মাইল পূর্বে তিনি আরেকটি বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্মপালের অপর নাম 'বিক্রমশীল' অনুসারে বিহারটির নাম দেয়া হয় বিক্রমশীল বিহার। তারনাথ উল্লেখ করেন যে, ধর্মপাল বৌদ্ধ শিক্ষার জন্য ৫০টি শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।

ধর্মপাল নিজে বৌদ্ধ হলেও হিন্দু ধর্মের প্রতি উদার ছিলেন। নারায়ণ মন্দিরের জন্য তিনি নিষ্কর ভূমিদান করেন। এটি তাঁর ধর্মীয় উদারতারই পরিচায়ক। ধর্মপালের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তিনি ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নীতি প্রবর্তন করেছিলেন।

দেবপাল

ধর্মপালের পর তাঁর পুত্র দেবপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন।তাঁর রাজত্বকাল দীর্ঘ ছিল। নালন্দা তাম্রশাসন দেবপালের ৩৫ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হয়।বাদল শিলালিপিতে দেখা যায় যে, গুরবমিশ্রের বংশের তিন পুরুষের তিনজন মন্ত্রী তাঁর অধীনে কর্মরত ছিলেন।আনুমানিক ৮২১ খ্রিঃ হতে ৮৬১খ্রিস্টাব্দ এর মধ্যে দেবপালের রাজত্বকাল নির্দিষ্ট করা যায়।দেবপালের উপাধি ছিল পরমেশ্বর, পরমভট্টারক এবং মহারাজধিরাজ।তিনি পিতা ধর্মপালের উপযুক্ত পুত্র ছিলেন এবং পাল সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।পাল রাজাদের লিপিমালায় দেবপালের কৃতিত্বের যে গুণগান করা হয়েছে তা অনেক ক্ষেত্রে ধর্মপালের গুণকীর্তনকেও ম্লান করে দেয়।এ থেকে অনুমান করা যায় যে, দেবপাল পিতার নীতি অনুসরণ করে সাম্রাজ্য বিস্তারে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর সাফল্যই সভাকবিগণকে প্রশস্তি রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

রাজ্য বিজয়

পাল লিপিমালায় দেবপালকে একজন মহান বিজয়ী রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। তাঁর সামরিক সাফল্য বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। নাগভট্টের পর প্রতীহার সাম্রাজ্যের দুর্বল উত্তরাধিকারী ও যুবক রাষ্ট্রকূটরাজা অমোঘবর্ষের নিস্প্রভতা দেবপালের জন্য রাজ্য বিস্তারের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। দেবপালের মুঙ্গের তাম্রশাসনে উল্লেখ রয়েছে যে, রাজ্য জয় উপলক্ষে তাঁর সৈন্যদল বিন্ধ্য পর্বত ও কম্বোজ (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত) অঞ্চলে অভিযান চালায়। তিনি উত্তরে হিমালয় হতে রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত এবং পূর্বে ও পশ্চিমে

সমুদ্র বেষ্টিত সমগ্র ভূভাগ শত্রুমুক্ত করে শাসন করেছিলেন বলেও এ তাম্রশাসনে উল্লেখ রয়েছে। দেবপালের মন্ত্রী দর্ভপানি ও কেদারমিশ্রের বংশের বাদল শিলা লিপিতেও দেবপালের রাজ্য জয়ের অনুরূপ বিবরণ রয়েছে। তবে এ লিপিতে তাঁর দক্ষিণের রাজ্যসীমা সেতুবন্ধের পরিবর্তে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত বলা আছে। এ লিপিতে আরো বলা হয়, দেবপাল উৎকল কুল ধ্বংস, হুনদের গর্ব খর্ব এবং দ্রাবিড় ও গুর্জর রাজাদের পরাজিত করে দীর্ঘকাল আসমুদ্র পৃথিবী ভোগ করেন। দেবপালের রাজ্যজয় সম্পর্কে নারায়ণপালের ভাগলপুর তাম্রশাসনে বলা হয়েছে যে, জয়পাল (দেবপালের পিতৃব্য বাকপালের পুত্র) ভাইয়ের আদেশে রাজ্য জয়ে অগ্রসর হলে উৎকলের রাজা দূর হতে তাঁর নাম শুনেই নিজ রাজধানী ত্যাগ করেন এবং প্রাগজ্যোতিষের (আসাম) রাজা তাঁর আদেশে যুদ্ধ ত্যাগ করে বন্ধুভাবাপন্ন অবস্থায় বাস করেন।

দেবপালের রাজ্যজয় সম্পর্কে মুঙ্গের তাম্রশাসনের তুলনায় পরবর্তীযুগের বাদল শিলালিপি ও ভাগলপুর লিপিতে অধিক প্রশস্তিমূলক বর্ণনা রয়েছে। তাছাড়া এগুলোতে রাজ্যসীমার যে বিবরণ রয়েছে তা ভারতীয় মানসে বহুদিন হতে সুপ্রতিষ্ঠিত উত্তর ভারতীয় সাম্রাজ্যের বিবরণ। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উত্তর ভারতের বহু নরপতির সাম্রাজ্য সম্বন্ধে এ ধরনের বিবরণ রয়েছে যা সর্বক্ষেত্রে সঠিক নয় বলে প্রমাণ আছে। সুতরাং দেবপালের সাম্রাজ্য উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কম্বোজ দেশ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল, এ কথা সমসাময়িক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তেমন বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাই দেবপালের কৃতিত্ব নির্ণয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

দেবপাল কর্তৃক উড়িষ্যা জয়ের প্রমাণ পাওয়া যায় বাদললিপি ও ভাগলপুর তাম্রশাসনে। তারনাথের বিবরণেও এর উল্লেখ আছে। দেবপাল ভঞ্জ বংশীয় রাজা রণভঙ্গের পরবর্তী কোন সময়ে হয়তো সীমান্তবর্তী রাজ্য উড়িষ্যা জয় করেছিলেন। এই সাফল্যের পর হয়তো তাঁর সৈন্যদল বিন্ধ্য পর্বত এবং আরো দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে পান্ড্যরাজার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল। পাল লিপিমালায় সৈন্যদলের বিন্ধ্যপর্বত অভিযান এবং দ্রাবিড় রাজার দর্পচূর্ণের কথা উল্লেখ আছে। লিপিতে উল্লেখিত দ্রাবিড় রাজা পান্ড্যরাজা হওয়া তেমন অস্বাভাবিক নয়।বরং উড়িষ্যা জয়ের পর আরো দক্ষিণে তাঁর সৈন্যদলের অগ্রসর ও পান্ড্যরাজার সাথে সংঘর্ষ ঘটা সম্ভব।সম্ভবত ৮৫১ থেকে ৮৬২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পান্ড্যরাজ শ্রীমার শ্রীবল্লভের বিরুদ্ধে দেবপালের সংঘর্ষ হয়েছিল।রামেশ্বর সেতুবন্ধ পান্ড্যরাজ্যেই অবস্থিত। তাই দেবপালের সভাকবি এই সমরাভিযান উপলক্ষ করেই দেবপালের রাজ্য রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত বলে বর্ণনা করেছেন।

কম্বোজ দেশের (উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তাঞ্চল) উল্লেখ তেমন যুক্তিযুক্ত নয় বলেই মনে হয়। তবে এই উল্লেখেরও একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানো সম্ভব। মুঙ্গের লিপিতে বলা হয়েছে, রাজ্য জয়কালে দেবপালের সৈন্যদলের হস্তিবাহিনী বিন্ধ্যপর্বতাঞ্চলে তাদের পুরনো সাথীদের সাথে মিলিত হয়েছিল। এরপর প্রশস্তিকার দেবপালের সৈন্যদলে ব্যবহৃত ঘোড়ার সঙ্গী খুঁজতে গিয়ে কম্বোজদেশের নাম উল্লেখ করেন। বলাবাহুল্য যে, কম্বোজদেশে ঘোড়া পাওয়া যায়। তবে সমসাময়িককালে উপমহাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও কম্বোজদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানকার কম্বোজদেশ বলতে সম্ভবত তিব্বতকে বুঝাতো। সুতরাং দেবপালের সাথে তিব্বতের সংঘর্ষের কথা বিবেচনায় আসতে পারে।

বাদল লিপিতে গুর্জরদের সাথে সংঘর্ষেরও উল্লেখ রয়েছে। মনে হয় পূর্বেকার পাল-গুর্জর প্রতীহার সংঘর্ষ দেবপালের রাজত্বকালেও ঘটেছিল। দেবপাল যে গুর্জর রাজার দর্পচূর্ণ করেছিলেন তিনি সম্ভবত নাগভট্টের পৌত্র প্রথম ভোজ। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের হাতে পরাজয়ের পর প্রতীহার রাজ নাগভট্ট ও তাঁর পুত্র রামভদ্রের শক্তি অতিশয় ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল। রামভদ্র শত্রু কর্তৃক বিধ্বস্ত হয়েছিলেন। এরূপ ইঙ্গিতও এ বংশের লিপিতে পাওয়া যায়। এ পরাজয় দেবপালের হাতে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রামভদ্রের পুত্র প্রথম ভোজ ৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে কনৌজে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন।তিনি ৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে রাষ্ট্রকূটরাজ কর্তৃক পরাজিত হন।গুর্জরদের বিরুদ্ধে দেবপালের সাফল্য প্রথম ভোজের বিরুদ্ধে ৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের পরে কোন এক সময়ে হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় দেবপাল পিতার ন্যায় কন্যকুব্জে আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং গুর্জরদের বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

ভাগলপুর তাম্রশাসন হতে জানা যায় দেবপালের সেনাপতি জয়পালের আদেশে প্রাগজ্যোতিষের (আসাম) রাজা যুদ্ধ ত্যাগ করে পাল সাম্রাজ্যের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলেন এ থেকে মনে হয়, দেবপাল পূর্ব সীমান্তবর্তী এই অঞ্চলের বিরুদ্ধেও সাফল্য অর্জন করেছিলেন। এছাড়া বাদল স্তম্ভলিপিতে হুনদের সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে সে বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব নয়। কেননা, হুন রাজ্যের অবস্থিতি কিংবা যে অঞ্চলে হুনদের দেবপাল পরাজিত করেছিলেন তা আজও নির্দেশ করা সম্ভব হয়নি।

ওপরের আলোচনা হতে বলা যায়, দেবপাল পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন। পিতার ন্যায় তিনিও বাংলার রাজ্যসীমা বিস্তারে সচেষ্ট হয়েছিলেন।সীমান্তবর্তী রাজ্য উড়িষ্যা ও আসামে তাঁর অভিযান সফল ছিল। উড়িষ্যায় সাফল্যের পর তাঁর সৈন্যদল দাক্ষিণাত্যের পান্ড্যরাজার বিরুদ্ধে ও বিন্ধ্য পর্বতাঞ্চলে অভিযান চালায়।এ দুটি অভিযানের ফলাফল সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা পাওয়া যায় না।তবে লিপিমালায় দেবপালের যে বিশাল উত্তর ভারতীয় সাম্রাজ্যের ইঙ্গিত রয়েছে তার বাস্তব ভিত্তি নেই।বরং প্রশস্তিকারের কল্পনায় এটি সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে দেবপালের সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

দেবপাল পিতার ন্যায় বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ছিলেন। তথাপি হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর উদার মনোভাব লক্ষ করা যায়। তাঁর মন্ত্রী কেদারমিশ্র ছিলেন একজন উচ্চবর্ণের হিন্দু। দেবপালের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসার লাভ করে। জাভা ও সুমাত্রার শৈলেন্দ্র রাজ কর্তৃক নালন্দায় প্রতিষ্ঠিত মঠের ব্যয় নির্বাহের জন্য দেবপাল পাঁচটি গ্রাম দান করেন। দেবপালের নালন্দা তাম্রশাসনে এই দানের উল্লেখ আছে। এ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বাংলার সাথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিরাজমান ছিল।

অরাজকতার যুগের অবসান ঘটিয়ে গোপাল পাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্মপাল ও দেবপাল উত্তর ভারতে সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ঘটিয়েছিলেন। বাংলার রাজার উত্তর ভারতে সাফল্য লাভ বাংলার ইতিহাসে অবশ্যই ঐতিহাসিক ঘটনা। বাংলার ইতিহাসে অনুরূপ সাফল্য পূর্বে বা পরে আর কখনও ঘটেনি। এই সাফল্য পাল সাম্রাজ্যের গৌরবের কথাই ঘোষণা করে। প্রায় এক শতাব্দীকাল ধরে এই তিনজন পাল রাজার রাজত্বকাল নি:সন্দেহে পাল রাজবংশের এবং ব্যাপকভাবে বাংলার ইতিহাসে গৌরবময় যুগের সূচনা করেছিল।

সারসংক্ষেপ

শশাঙ্কের পরবর্তী প্রায় একশত বছর বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে অস্থির অবস্থা বিরাজমান ছিল যা 'মাৎস্যন্যায়ম্' হিসেবে পরিচিত। এই অস্থির বা অরাজকতার যুগের অবসান ঘটিয়ে গোপাল বাংলার সিংহাসনে আরোহণ এবং পালবংশের শাসনের সূচনা করেন। গোপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শাসনের ওপর ভিত্তি করে তাঁর পরবর্তী দুই উত্তরাধিকারী ধর্মপাল ও দেবপাল পাল সাম্রাজ্যকে উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত করতে সক্ষম হন। ধর্মপাল উত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ রাখেন এবং ত্রিপক্ষীয় সংঘর্ষে অংশ নিয়ে বাংলার পক্ষে গৌরব অর্জন করেন। ধর্মপালের অধীনেই বাংলার নতুন শক্তি ও উদ্দীপনার সূচনা হয়। উদার ধর্মীয় নীতির চর্চা, শিল্পকলার নজির সৃষ্টি এবং সোমপুর মহাবিহার নির্মাণের মাধ্যমে তিনি তাঁর গৌরবকে বৃদ্ধি করেন। ধর্মপালের পুত্র দেবপাল ছিলেন পিতার যোগ্য উত্তরসুরী। তিনি পাল সাম্রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হন এবং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রাজ্য শাসন করেন। গোপাল, ধর্মপাল এবং দেবপালের রাজত্বকাল নিঃসন্দেহে পাল রাজবংশের এবং ব্যাপকভাবে বাংলার ইতিহাসে গৌরবময় যুগের সূচনা করেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। 'মাৎস্যন্যায়ম্' কাল কোনটি?
- (ক) অষ্টম শতাব্দী থেকে নবম শতাব্দী
- (খ) সপ্তম শতাব্দী থেকে অষ্টম শতাব্দী
- (গ) অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি
- (ঘ) সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি।

২। গোপালের পিতার নাম–
- (ক) বপ্যট
- (খ) সুভট
- (গ) তাতট
- (ঘ) দয়িতবিষ্ণু।

৩। রাষ্ট্রকূট বংশ কোন অঞ্চলে রাজত্ব করতো?
- (ক) মধ্য এশিয়ায়
- (খ) মধ্য ভারতে
- (গ) রাজস্থানে
- (ঘ) দাক্ষিণাত্যে।

৪। ত্রিপক্ষীয় সংঘর্ষের ৩টি পক্ষ কারা?
- (ক) গুর্জর-প্রতীহার, গৌড়, মালব
- (খ) গুর্জর-প্রতীহার, পাল, সেন
- (গ) গুর্জর-প্রতীহার, রাষ্ট্রকূট, পাল
- (ঘ) পাল, রাষ্ট্রকূট, গৌড়।

৫। ধর্মপালের চোখের ইশারায় কান্যকুব্জের সিংহাসনে বসেন–
- (ক) ইন্দ্রায়ুধ
- (খ) চক্রায়ুধ
- (গ) ধ্রুবধারাবর্ষ
- (ঘ) বৎসরাজ।

৬। সোমপুর মহাবিহার কোথায় অবস্থিত?
- (ক) পাহাড়পুর
- (খ) ময়নামতিতে
- (গ) মহাস্থানে
- (ঘ) বাণগড়ে।

৭। দেবপাল সম্পর্কে জানার প্রধান উৎস কোনটি?
- (ক) খালিমপুর তাম্রশাসন
- (খ) বাদল শিলালিপি
- (গ) ভাগলপুর তাম্রশাসন
- (ঘ) লামা তারনাথ।

৮। দেবপাল সফল অভিযান পরিচালনা করেন–
- (ক) দাক্ষিণাত্যে
- (খ) উড়িষ্যা ও আসামে

(গ) বিহারে (ঘ) বিন্ধ্য পার্বত্যাঞ্চলে।

৯। কেদার মিশ্র কার শাসনামলে মন্ত্রি ছিলেন?

(ক) ধর্মপালের (খ) গোপালের

(গ) দেবপালের (ঘ) মহীপালের।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। শশাঙ্ক পরবর্তী বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল?

২। ধর্মপাল সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। 'মাৎসন্যায়ম্' অর্থ কি? গোপাল কর্তৃক পালবংশ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। 'উদীয়মান প্রতিপত্তির যুগ' বলতে কি বোঝায়? এই যুগের উল্লেখ যোগ্য ঘটনা পর্যালোচনা করুন।

৩। ধর্মপালের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন। তিনি কি সমগ্র উত্তর ভারতের অধিপতি ছিলেন?

৪। ত্রিপক্ষীয় সংঘর্ষের বিশেষ উল্লেখ পূর্বক ধর্মপালের সাফল্য চিহ্নিত করুন। তাঁর রাজ্যসীমা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল?

৫। দেবপালের রাজ্যবিজয় কাহিনী পর্যালোচনা করুন। তাঁর সাম্রাজ্যসীমা চিহ্নিত করুন।

৬। দেবপালের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। Abdul Momin Chowdhury, *Dynastic History of Bengal.*

২। R.C. Majumdar, *History of Ancient Bengal.*

৩। আবদুল মমিন চৌধুরী ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস।*

৪। রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১ম খন্ড।

পাঠ - ২

পাল সাম্রাজ্য: অবনতি ও পুনরুদ্ধার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- পাল সাম্রাজ্যের অবনতি ও পুনরুদ্ধার সম্পর্কে ধারণা পাবেন ;
- মহারাজাধিরাজ মহেন্দ্রপাল সম্পর্কে তথ্যপাবেন ;
- কম্বোজ পাল বংশের উত্থান সম্পর্কে জানতে পারবেন ;
- পাল সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধারকর্তা প্রথম মহীপালের কৃতিত্ব বিষয়ে অবহিত হবেন।

দেবপালের মৃত্যুর পর পাল সিংহাসনে কে অধিষ্ঠিত ছিলেন তা নিয়ে মতভেদ আছে। বাদল স্তম্ভলিপিতে শূরপালের নাম এবং নারায়ণপালের ভাগলপুর তাম্রশাসনে বিগ্রহপালের নাম পাওয়া যায়। বিগ্রহপাল ছিলেন জয়পালের পুত্র এবং ধর্মপালের ভ্রাতা বাক্‌পালের পৌত্র। অধিকাংশ ঐতিহাসিক শূরপাল ও বিগ্রহ পালকে এক ও অভিন্ন মনে করলেও এর কোন প্রমাণ নেই। যে কারণে কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁদেরকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি মনে করে দেবপালের পর উত্তরাধিকার যুদ্ধের কথা অনুমান করেন। বিগ্রহপালের পুত্র নারায়ণপাল হতে যারা পাল সিংহাসন অধিকার করেন তাঁরা সকলেই বিগ্রহপাল তথা ধর্মপালের ভ্রাতা বাক্‌পালের বংশধর। অর্থাৎ দয়িতবিষ্ণু হতে দেবপাল পর্যন্ত যে সরাসরি উত্তরাধিকার চলে আসছিল তা পরিবর্তিত হয়ে বাক্‌পালের বংশের হাতে ক্ষমতা চলে যায়।এ ধরনের পরিবর্তন সাধারণত উত্তরাধিকার যুদ্ধের পরিণতিতেই ঘটে থাকে। এই যুক্তির ওপর ভিত্তি করেই শূরপাল ও বিগ্রহপালকে ভিন্ন ব্যক্তি গণ্য করে এক উত্তরাধিকার যুদ্ধের কথা অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, তবে এ বিষয়ে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।

মহেন্দ্রপাল

সম্প্রতিকালে আবিষ্কৃত একটি তাম্রশাসন এ সময়কার পাল বংশের ইতিহাসে এক নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছে।পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার জগ্‌জীবনপুর গ্রামে আবিষ্কৃত এই তাম্রশাসনটি দেবপালের পুত্র মহারাজাধিরাজ মহেন্দ্রপালের। সুতরাং দেবপালের পর মহেন্দ্রপাল পাল সিংহাসন অধিকার করেছিলেন বলে প্রমাণিত হয়। তিনি সম্ভবত শূরপালের ভ্রাতা এবং তিনি ৮/১০ বছর রাজত্ব করেছিলেন। এই নতুন পাল সম্রাট (ইদানিং তাঁর সম্পর্কে জানা গিয়েছে, এই অর্থে নতুন) ও পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত লিপিতে উল্লেখিত রাজা মহেন্দ্রপাল যে এক ও অভিন্ন ছিল সে বিষয়ে এখন আর কোন সন্দেহ নেই।এতদিন পর্যন্ত ঐতিহাসিকগণ পাহাড়পুর লিপিতে উল্লেখিত রাজা মহেন্দ্রপালকে প্রতীহার বংশের মহেন্দ্রপাল বলে মনে করতেন এবং পাহাড়পুর লিপির ভিত্তিতে এও মনে করেছেন যে, প্রতীহারদের আধিপত্য উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। কিন্তু জগ্‌জীবনপুর তাম্রশাসন আবিষ্কারের পর এ ধারণা ভ্রান্ত বলে মনে হচ্ছে। এই মহেন্দ্রপাল পাল বংশীয় রাজা হওয়াই অধিকতর সঙ্গত বলে মনে হয়।

এই তাম্রশাসন আবিষ্কারের ফলে এখন যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা দেবপালের পর পাল সাম্রাজ্যের অবস্থা সম্পর্কিত। একথা মনে করার অবকাশ সৃষ্টি হয়েছে যে, দেবপালের পর পাল সাম্রাজ্যের বিভক্তি ঘটেছে; সেই সময়ে মহেন্দ্রপাল, শূরপাল ও বিগ্রহ পাল সমসাময়িকভাবে সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশে রাজত্ব করেছেন। এবং তাঁদের রাজত্বের পরই পাল বংশের সিংহাসনে বংশানুক্রমিক ধারার পরিবর্তন ঘটে।

মহেন্দ্রপাল, শূরপাল ও বিগ্রহপাল অল্প সময় রাজত্ব করেন।শূরপালের পঞ্চম রাজ্যাঙ্কের লিপি পাওয়া গেছে। ভাগলপুর তাম্রশাসন হতে জানা যায় যে, বিগ্রহপাল শান্তিপ্রিয় ও সংসার বিরাগী ছিলেন। তিনি অল্পকাল রাজত্ব করে পুত্র নারায়ণপালের হাতে রাজ্যভার হস্তান্তর করে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন।

নারায়ণপাল

নারায়ণপাল দীর্ঘকাল পাল রাজবংশে রাজত্ব করেন। তাঁর ৫৪ রাজ্যাঙ্কের একটি লিপির ওপর ভিত্তি করে অনুমান করা হয় যে তিনি ৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ হতে ৯২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ররাজত্ব করেন। নারায়ণপাল পিতার ন্যায় শান্তিপ্রিয় ছিলেন। সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে তাঁর উদ্যোগের অভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ঐ সময় পর্যন্ত উৎকীর্ণ বিভিন্ন লিপি হতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাঁর রাজত্বের ১৭ বছর পর্যন্ত বাংলা ও বিহারে তাঁর ক্ষমতা অক্ষুন্ন ছিল।কিন্তু তারপরই বিভিন্ন বহি:শত্রুর আক্রমণে পাল সাম্রাজ্য বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। বাদল স্তম্ভলিপি বা তাঁর নিজস্ব ভাগলপুর তাম্রশাসনে তাঁর সামরিক সাফল্যের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। বরং উভয় লিপিতেই তাঁর ধর্মীয় মনোভাব ও উদারতার উল্লেখ রয়েছে।

নারায়ণ পালের রাজত্বকালে পাল সাম্রাজ্য বহি:শত্রুর আক্রমণে অনেকাংশে সংকুচিত হয়েছিল।রাষ্ট্রকূট লিপিতে উল্লেখ আছে, অমোঘবর্ষ অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধের অধিপতিকে পরাজিত করেছিলেন। এ থেকে ধারণা করা হয় যে, নারায়ণপালকেই অমোঘবর্ষ পরাজিত করেছিলেন। রাষ্ট্রকূট বিজয়ের ফলে পাল সাম্রাজ্যের কোন অংশ রাষ্ট্রকূট রাজ্যভুক্ত হয়েছিল বলে জানা যায় না, তবে প্রতীহার রাজাদের আক্রমণের দরুন পাল সাম্রাজ্য যথেষ্ট সংকুচিত হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। মগধ ও উত্তর বিহারে প্রতীহার রাজা মহেন্দ্রপালের (৮৮৫-৮৯০ খ্রি:) সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। দিঘ্ওয়া-দুবাওলি তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে যে, উত্তর বিহার প্রতীহার সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করেছিল। মহেন্দ্রপালের সভাকবি রাজশেখর রচিত 'কর্পূরমঞ্জুরি' গ্রন্থেও এই বিজয়ের উল্লেখ আছে। অনুমান করা হয়, ভোজের রাজত্বের শেষ দিকে প্রতীহারদের প্রতিপত্তি বিস্তার শুরু হয়েছিল। দেবপালের জীবদ্দশায় প্রতীহারগণ তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারেননি।কিন্তু দেবপালের মৃত্যুর পর প্রতীহাররাজ ভোজের রাজত্বের শেষ দিক হতে প্রতীহার রাজ মহেন্দ্রপালের রাজত্বের প্রথম দিকে (অর্থাৎ ৮৮৩-৮৮৬ খ্রি:) প্রতীহাররা বিহার পর্যন্ত তাঁদের অধিকার বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল। ৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের পর পাল সাম্রাজ্য বাংলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলে ধারণা করা হয়।

দেবপালের দুর্বল উত্তরাধিকারীদের উৎসাহ ও উদ্যোগের অভাবে নবম শতাব্দীর শেষদিকে পাল সাম্রাজ্য চরম দুর্দশায় উপনীত হয়। অবশ্য নারায়ণপাল তাঁর রাজত্বের শেষদিকে বিহারে তাঁর অধিকার পুন:প্রতিষ্ঠা করেন। মহেন্দ্রপালের পর রাষ্ট্রকূট বংশীয় রাজা দ্বিতীয় কৃষ্ণ ও তৃতীয় ইন্দ্রের আক্রমণ প্রতীহারদের বিরুদ্ধে পাল রাজাদের সুবিধা করে দিয়েছিল। ফলে নারায়ণপাল বিহারে ক্ষমতা পুন:প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

নারায়ণপালের পর তাঁর পুত্র রাজ্যপাল (আনুমানিক ৯২০-৯৫২ খ্রি:) এবং রাজ্যপালের পুত্র দ্বিতীয় গোপাল (আনুমানিক ৯৫২-৯৬৯ খ্রি:) রাজত্ব করেন। পাল তাম্রশাসনসমূহে তাঁদের সুগভীর জলাশয় খনন ও সুউচ্চ মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখিত হয়েছে। এ থেকে মনে করা হয় যে, তাঁদের রাজত্বকালে নতুন কোন বিজয় সূচিত হয়নি। তবে রাজশাহী জেলার অন্তর্গত ভাতুরিয়ায় প্রাপ্ত একটি শিলালিপিতে প্রসঙ্গক্রমে রাজ্যপালের উল্লেখ রয়েছে।এ লিপির অষ্টম শ্লোকে রয়েছে, যশোদাসের (রাজ্যপালের মন্ত্রী) প্রভুর আজ্ঞা ম্লেচ্ছ, কলিঙ্গ, বঙ্গ, ওড্র, পান্ড্য, কর্ণাট, লাট, সুহ্ম, গুর্জর, ক্রীত ও চীনদেশীয়গণ শিরোধার্য করতো। খুব স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় এই শ্লোকে যথেষ্ট অতিরঞ্জন রয়েছে। হয়তো পার্শ্ববর্তী দুএকটি রাজ্যের বিরুদ্ধে রাজ্যপাল সাফল্য অর্জন করেছিলেন, এই সাফল্যের উল্লেখ করতে গিয়ে সম্ভবত প্রশস্তিকার কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন।

রাজ্যপালের পরবর্তী দুজন পাল শাসকের নাম দ্বিতীয় গোপাল ও দ্বিতীয় বিগ্রহপাল। বিভিন্ন লিপি প্রমাণে বলা যায়, দ্বিতীয় গোপালের রাজত্বের প্রথমদিকে বিহার ও উত্তর-পশ্চিম বাংলায় পাল আধিপত্য বজায় ছিল। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় গোপাল ও দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে (আনুমানিক ৯৬৯-৯৯৫ খ্রি:)পাল সাম্রাজ্য উত্তর ভারতের প্রতীহার সাম্রাজ্যের বিলুপ্তির পর চন্দেল ও কলচুরি বংশীয় রাজাদের আক্রমণের

শিকার হয়েছিল। লিপি প্রমাণ আছে যে, ৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের কিছু আগে চন্দেল- রাজ যশোবর্মা গৌড়াধিপতিকে পরাজিত করেছিলেন। যশোবর্মার পুত্র ধঙ্গ ৯৫৪ খ্রি: হতে ১০০২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময় পাল সাম্রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন। প্রায় সমসাময়িক কালে কলচুরিরাজ প্রথম যুবরাজ ও লক্ষণরাজও পাল সাম্রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন। উপর্যুপরি বিদেশী আক্রমণের দরুন পাল সাম্রাজ্যের ভিত্তি ক্রমশ: দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে এ সময় পাল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে উত্তর ও পশ্চিম বাংলার অংশবিশেষে কম্বোজ নামক রাজবংশের অভ্যুত্থান ঘটে। এ সময় অঙ্গ ও মগধ অঞ্চলে পাল সাম্রাজ্য সীমাবদ্ধ ছিল বলে অনুমান করা হয়।

কম্বোজ পাল বংশ

দ্বিতীয় গোপালের রাজত্বের শেষ দিকে এবং দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বের প্রথম দিকে পাল সাম্রাজ্য যখন বৈদেশিক আক্রমণে জর্জরিত, সে সুযোগে পাল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল উত্তর ও পশ্চিম বাংলায় কম্বোজ বংশসম্ভূত পাল রাজাদের উত্থান ঘটে।

কম্বোজরা কারা এবং কিভাবে ক্ষমতা দখল করেছিল, কোন উৎসেই সে বিষয়ের কোন সঠিক নির্দেশনা নেই। তাই ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে নানান মত প্রকাশ করেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী কম্বোজ জাতি এসে বাংলায় ক্ষমতা দখল করেছিল বলে মনে হয় না। বাংলার কাছাকাছি বসবাসরত তিব্বতীয়দের কোন কোন গ্রন্থে 'কম্বোজ' নামে অভিহিত করা হয়।লুসাই পর্বতের নিকটবর্তী বঙ্গ ও ব্রহ্মদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলেও কম্বোজ জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার কারো মতে, কম্বোজ, 'কোচ' শব্দের রূপান্তর। অর্থাৎ সুপরিচিত কোচ জাতিই প্রাচীন কম্বোজ জাতির বংশধর। তবে কম্বোজরা বাইরে থেকে এসে বাংলায় তাঁদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এমন মনে করার কোন যৌক্তিকতা নেই। বরং কম্বোজ জাতির লোক পাল সাম্রাজ্যে কোন রাজকর্মে নিযুক্ত থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। তাঁদেরই কেউ পাল শাসনের দুর্বলতার সুযোগে স্বীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এমন মনে করাও খুব অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং কম্বোজদের উৎপত্তি সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণা না পেলেও অনুমান করা হয় যে, পাল রাজ্যের মধ্য হতেই সাফল্যজনক উত্থানের ফলশ্রুতিতে উত্তর ও পশ্চিম বাংলায় কম্বোজরা শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। দশম শতাব্দীর প্রথমদিকে কম্বোজদের উত্থান ঘটে এবং শতাব্দীর মাঝামাঝি কালে তাঁদের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইর্দা তাম্রশাসন হতে এই বংশের তিনজন রাজার নাম পাওয়া যায়। এঁরা হলেন রাজ্যপাল, যাঁকে কম্বোজ বংশতিলক বলা হয়েছে এবং রাজ্যপালের দুই পুত্র– নারায়ণপাল ও নয়পাল।

উত্তর ও পশ্চিম বাংলায় কম্বোজদের রাজত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় দশম শতাব্দীর দিনাজপুর স্তম্ভলিপি ও ইর্দা তাম্রশাসন থেকে। দিনাজপুরে প্রাপ্ত স্তম্ভলিপিতে কম্বোজ বংশীয় গৌড়পতি কর্তৃক একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার কথা লিপিবদ্ধ আছে। নয়পালের ইর্দা তাম্রশাসনে নয়পালের পিতা এবং পূর্ববর্তী রাজা রাজ্যপালকে কম্বোজ বংশতিলক হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। প্রথম মহীপালের বেলওয়া ও বাণগড় তাম্রশাসনের একটি শ্লোকে কম্বোজ রাজাদের উত্থানের পরোক্ষ সমর্থন পাওয়া যায়। শ্লোকে বলা হয়েছে যে, প্রথম মহীপাল শত্রুদেরকে পরাজিত করে অনধিকারী কর্তৃক বিলুপ্ত পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেছিলেন। এই অনধিকারীগণ খুব সম্ভবত কম্বোজ বংশীয় গোড়পতিগণই ছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার চন্দ্রবংশীয় রাজা শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনে ত্রৈলোক্য চন্দ্রের সময়ে (দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগে) কম্বোজদের অদ্ভূত কার্যের উল্লেখ রয়েছে। কম্বোজদের উত্থানই দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় 'কম্বোজদের অদ্ভূত বার্তা' বলে উল্লেখিত হয়েছে।

ওপরের প্রমাণসমূহ হতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব যে, দশম শতাব্দীর প্রথম দিকে কম্বোজদের উত্থান শুরু হয়। উত্তর বাংলায় তাঁদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে পশ্চিমবাংলায়ও তাঁদের শাসন বিস্তার লাভ করে। ঐ সময়ে পাল রাজ্য অঙ্গ ও মগধ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল বলে অনুমান করা হয়।

তিনজন রাজার নাম ব্যতিত কম্বোজ শাসন সম্বন্ধে আর তেমন কিছু জানা যায় না। দশম শতাব্দীর শেষদিকেও নয়পাল রাজত্ব করতেন বলে লিপি প্রমাণ রয়েছে। দাক্ষিণাত্যের চোল বংশীয় সূত্র হতে জানা

যায়, একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দন্ডভুক্তি অঞ্চলে ধর্মপাল নামে একজন রাজা ছিলেন। চোল রাজা রাজেন্দ্র চোলের সৈন্যদল বিজয়াভিযানে (১০২১-১০২৪ খ্রিঃ) ধর্মপাল দন্ডভুক্তিতে পরাজিত হয়েছিলেন। অনেকে অনুমান করেন, এই ধর্মপাল কম্বোজ পালদের সাথে সম্পর্কিত ছিল। তবে এমনও হতে পারে যে, প্রথম মহীপাল কর্তৃক উত্তর বাংলায় ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের পর হয়তো কিছুদিন কম্বোজ পাল রাজাগণ দক্ষিণ পশ্চিম বাংলায় তাঁদের শাসন বজায় রেখেছিলেন। রাজেন্দ্র চোলের অভিযান কম্বোজদের অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটায়।

প্রথম মহীপাল ঃ পাল সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধার

দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পর তাঁর পুত্র প্রথম মহীপাল পাল বংশের রাজা হন। তাঁর রাজত্বের ৪৮ বছরে ইমাদপুর লিপি প্রকাশিত হয়। সুতরাং অনুমান করা হয় প্রথম মহীপাল প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল (৯৯৫-১০৪৩ খ্রিঃ) রাজত্ব করেন। এই দীর্ঘ রাজত্বকালে তিনি পাল সাম্রাজ্যকে নবজীবন দান করেন। তাই পাল বংশের ইতিহাসে প্রথম মহীপাল স্মরণীয় হয়ে আছেন।

প্রথম মহীপালের পূর্বে পাল সাম্রাজ্যের যথেষ্ট সংকোচন ঘটে। এমনকি পালদের আদি বাসস্থান উত্তর বাংলায়ও ভিন্ন রাজশক্তির উদ্ভব ঘটে। প্রথম মহীপাল সিংহাসনে আরোহণ করার সময় পাল সাম্রাজ্য অঙ্গ ও মগধে সীমাবদ্ধ ছিল বলে মনে হয়। মহীপাল অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সাম্রাজ্যের বিলুপ্ত অংশ পুনরুদ্ধার করে পুনরায় পাল সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটান। তাঁর বেলওয়া (পঞ্চম রাজ্যাঙ্কে) ও বাণগড় (নবম রাজ্যাঙ্কে) তাম্রশাসনে এই পুনরুদ্ধারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এ দুটি তাম্রশাসন দ্বারা পুন্ড্রবর্ধনভুক্তিতে (উত্তর বাংলা) ভূমিদান ঐ অঞ্চলে পাল আধিপত্যই প্রমাণ করে।

কুমিল্লা জেলার বাঘাউরা ও নারায়ণপুরে প্রাপ্ত দুটি মূর্তিলিপির প্রমাণে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায়ও প্রথম মহীপালের সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করেছিল।অল্প সময়ের ব্যবধানে পালবংশে দুজন মহীপাল রাজত্ব করেছিলেন। ফলে মূর্তিদ্বয়ে উল্লেখিত মহীপাল প্রথম মহীপাল না দ্বিতীয় মহীপাল তা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে, এই মূর্তি লিপিদ্বয় দ্বিতীয় মহীপালের সময়কার। কিংবা মূর্তিদ্বয় বহিরাগত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

মগধ অঞ্চলে প্রথম মহীপালের আধিপত্যের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজত্বের শেষদিকে তিনি উত্তর বিহার অঞ্চলেও আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। বারাণসীর নিকটবর্তী প্রাচীন বৌদ্ধতীর্থ সারনাথে প্রাপ্ত প্রথম মহীপালের রাজত্বের ১০৮৩ বিক্রম সম্বতে (১০২৬ খ্রিঃ) উৎকীর্ণ একটি লিপি প্রমাণে অনুমান করা হয় যে, বারাণসী পর্যন্ত মহীপালের রাজত্ব বিস্তার লাভ করেছিল।কেবলমাত্র এই একটি লিপি প্রমাণে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যুক্তসঙ্গত কিনা তা বিচার সাপেক্ষ। যদি বাস্তবিকই রাজ্যের এই সম্প্রসারণ হতো তাহলে পাল লিপিমালায় লিপিবদ্ধ প্রশস্তিসমূহে এ বিষয়ে আরও প্রত্যক্ষ উল্লেখ থাকতো। কিন্তু মহীপাল বা পরবর্তী রাজাদের তাম্রলিপিতে এ বিষয়ে কোন উল্লেখ না থাকায় সারনাথে মহীপালের ক্ষমতা বিস্তারের প্রমাণ হিসেবে সারনাথ লিপিকে মূল্যায়ন করা যুক্তিসঙ্গত নয়। বরং এই লিপিতে কেবল তাঁর ধর্ম-কর্মের কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে।

দাক্ষিণাত্যের চোলরাজ রাজেন্দ্রচোলের তিরুমুলাই লিপি মহীপালের সমসাময়িক বাংলার ইতিহাসের ওপর যথেষ্ট আলোকপাত করে। এই লিপিতে রাজেন্দ্রচোল কর্তৃক এক বিজয়াভিযানের কথা উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে তাঁর সেনাপতি বঙ্গের সীমান্তে উপস্থিত হয়ে প্রথমে দন্ডভুক্তিরাজ ধর্মপাল ও পরে দক্ষিণ রাঢ়ের অধিপতি রণশূরকে পরাজিত করে বঙ্গালদেশে রাজা গোবিন্দ চন্দ্রকে পরাজিত করেন।এরপর শক্তিশালী প্রথম মহীপালের সাথে তাঁর যুদ্ধ হয় উত্তর রাঢ়ে এবং মহীপাল ভীত হয়ে রণস্থল ত্যাগ করেন।চোল সেনাপতি পাল রাজার দুর্দম রণহস্তি, নারীগণ ও ধনরত্ন লুণ্ঠনপূর্বক উত্তর রাঢ় অধিকার করে গঙ্গাতীরে উপনীত হন। এই বর্ণনা হতে বোঝা যায়, মহীপাল উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলায় রাজত্ব করতেন। দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় ভিন্ন ভিন্ন রাজত্ব বিদ্যমান ছিল।

প্রথম মহীপালের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশে মুসলমানদের আক্রমণ শুরু হয়। গজনীর সুলতানদের উপর্যুপরি ভারত আক্রমণে পরাক্রান্ত সাহী ও প্রতীহার বংশ ধ্বংস হয়। অন্যান্য রাজবংশ বিপর্যস্ত হয় এবং একের পর এক প্রসিদ্ধ মন্দির-নগর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই বহি:শত্রুর আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে মহীপাল কোন পদক্ষেপ বা সাহায্য প্রেরণ করেননি। এজন্য কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁকে দোষারোপ করেছেন। অনেকে মন্তব্য করে বলেন, সম্রাট অশোকের ন্যায় প্রথম মহীপালও উত্তর বাংলা পুনরুদ্ধারের পর সমরযাত্রা ত্যাগ করে ধর্মীয় ও জনহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু মহীপালের ইতিহাস সম্যক আলোচনা করলে এ ধরনের অভিযোগকে সমর্থন করা যায় না। পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করে তিনি যথেষ্ট শৌর্যবীর্যের পরিচয় দেন। এরপর রাজেন্দ্রচোলের অভিযানের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার কারণে সুদূর পঞ্চনদ অঞ্চলে সৈন্য প্রেরণ মহীপালের পক্ষে সম্ভব ছিল না।তাছাড়া মুসলিম আক্রমণ তাঁর রাজ্যসীমায় এসে পৌঁছায়নি। ফলে তাঁর উদ্বেগের কোন কারণ ছিল না।সে সময় সমগ্র উত্তর ভারত ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশের শাসনাধীন থাকায় সর্বভারতীয় সম্মিলিত প্রতিরোধের কথা কল্পনা করা যায় না।আক্রান্ত রাজ্যসমূহ অবস্থার চাপে পড়ে সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের প্রতিরোধ করেছিল। ভারতের পূর্ব সীমান্তের পাল রাজ্যের পক্ষে এই প্রচেষ্টায় যোগ দেয়ার কারণ নেই। সুতরাং এসব দিক দিয়ে বিবেচনা করে প্রথম মহীপালকে ভীরু, কাপুরুষ এবং দেশের প্রতি কর্তব্য পালনে উদাসীন ইত্যাদি দোষে অভিযুক্ত করা অযৌক্তিক।

প্রথম মহীপালের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল, পাল সাম্রাজ্যকে আসন্ন বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা। বিহার, উত্তর বাংলা ও পশ্চিম বাংলায় সাম্রাজ্য পুন:প্রতিষ্ঠা করে তিনি পাল সাম্রাজ্যকে নবজীবন দান করেন। রাজত্বের শেষ দিকে তিনি মিথিলা (উত্তর বিহার) অঞ্চলেও আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। তবে বারাণসী পর্যন্ত মহীপালের রাজ্য বিস্তারের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রথম মহীপাল পাল রাজ্য সম্প্রসারণ ব্যতিত ধর্মীয় ও জনহিতকর কার্যেও অবদান রাখেন। বাংলার অনেক দিঘী ও নগরী, যেমন– রংপুর জেলার মাহীগঞ্জ, বগুড়া জেলার মাহীপুর, দিনাজপুর জেলার মাহীসন্তোষ ও মুর্শিদাবাদ জেলার মহীপাল নগরী; দিনাজপুরের মহীপাল দীঘি, মুর্শিদাবাদের মহীপালের সাগরদীঘি ইত্যাদি সবই মহীপালের স্মৃতি বহন করছে। তাছাড়া অসংখ্য লোকগাঁথায় মহীপালের নাম জড়িত ছিল। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভগবতে উল্লেখ আছে যে, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মহীপালের এসব গীতিকা খুবই জনপ্রিয় ছিল। দুঃখের বিষয় এসব গীতিকা আজকাল শোনা যায় না। তবে 'ধান ভানতে মহীপালের গীত' লৌকিক প্রবাদের প্রচলন তাঁর জনপ্রিয়তারই পরিচয় বহন করে। সম্ভবত জনহিতকর কার্যাবলীর মাধ্যমে মহীপাল এই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন।

মহীপালের ধর্মীয় কীর্তি সংরক্ষণ ও নির্মাণের বহু প্রমাণ রয়েছে। সারনাথ লিপি বিখ্যাত বৌদ্ধতীর্থে মহীপাল কর্তৃক বিভিন্ন ধর্মীয় কীর্তি রক্ষণ ও নির্মাণের পরিচয় বহন করে। এছাড়া অগ্নিদাহে বিনষ্ট নালন্দা মহাবিহারে ও বুদ্ধগয়ায় দুটি মন্দির তাঁর সময়ে নির্মিত হয়। পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষ থেকেও মহীপালের সময়ে এই বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সংস্কার ও নির্মাণ কার্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

দেবপালের পর প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাবে পাল সাম্রাজ্যের যে অবনতি ঘটেছিল তা অব্যাহত থাকলে পাল রাজবংশের শাসন প্রায় চারশত বছর টিকে থাকা খুবই অসম্ভব ছিল।দক্ষিণ বিহারে সীমাবদ্ধ পাল সাম্রাজ্য মহীপালের রাজত্বকালে উত্তর ও পশ্চিম বাংলায় পুন:প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিই তাঁর সর্বশ্রেষ্ট কৃতিত্ব। তাছাড়া পাল সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের পর ধর্মীয় ও জনহিতকর কাজে মনোনিবেশের কারণেই মহীপালের জনপ্রিয়তা বহুকাল পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। তাই বলা যায়, পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার এবং ধর্মীয় ও জনহিতকর কার্যাবলী প্রথম মহীপালকে পাল রাজবংশের ইতিহাসে চির স্মরণীয় করে রেখেছে।

সারসংক্ষেপ

দেবপালের মৃত্যুর পর পাল সাম্রাজ্যে সম্ভবত বিভক্তি দেখা দেয়। সাম্প্রতিককালের জ্ঞান থেকে ঐতিহাসিকদের অনুমান, দেবপালের পুত্র মহারাজাধিরাজ মহেন্দ্রপাল এবং অন্যান্য পাল রাজা

শূরপাল, বিগ্রহপাল প্রমুখ সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশে রাজত্ব করেন। নারায়ণপালের অধীনে পাল রাজত্বের দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়। ক্রমেই উপর্যুপরি বিদেশি আক্রমণে পাল সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় গোপালের রাজত্বের শেষ দিকে কম্বোজ বংশসম্ভুত পালদের উত্থান ঘটে। প্রথম মহীপাল এদের কাছ থেকেই সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। মহীপাল উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলায় রাজত্ব করেন। তাঁর হাতেই পাল সাম্রাজ্য নবজীবন পায়। সামগ্রিকভাবে প্রথম মহীপাল ছিলেন প্রাচীন বাংলার একজন জনপ্রিয় রাজা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। দেবপালের পরবর্তী পাল রাজা ছিলেন–

(ক) শূরপাল (খ) মহেন্দ্রপাল

(গ) নারায়ণপাল (ঘ) বিগ্রহপাল।

২। কম্বোজদের রাজত্বের তথ্যপাওয়া যায় কোন তাম্রশাসনে?

(ক) খালিমপুর তাম্রশাসন (খ) মুঙ্গের তাম্রশাসনে

(গ) বাদলশিলালিপিতে (ঘ) ইর্দা তাম্রশাসনে।

৩। কোন তাম্রশাসনে কম্বোজদের অদ্ভূত কার্যের উল্লেখ আছে–

(ক) পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনে (খ) নিধনপুর তাম্রশাসনে

(গ) ইর্দা তাম্রশাসনে (ঘ) ভাগলপুর তাম্রশাসনে।

৪। প্রথম মহীপালের রাজত্বকাল–

(ক) ৮৯৫–৯৪৩ খ্রিঃ পর্যন্ত (খ) ৯৪৩–১০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত

(গ) ৯৯৫–১০৪৩ খ্রিঃ পর্যন্ত (ঘ) ১০৪৩–১০৯৫ খ্রিঃ পর্যন্ত।

৫। সারনাথ লিপি সূত্রে অনুমিত হয়মহীপালের সাম্রাজ্য প্রসারিত হয়েছিল–

(ক) বিহার পর্যন্ত (খ) দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত

(গ) কামরূপ পর্যন্ত (ঘ) বারাণসী পর্যন্ত।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। কম্বোজদের উত্থান ও শাসন সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

২। নারায়ণপালের রাজত্বকাল সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। অবনতিকালে পাল সাম্রাজ্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করুন।

২। পাল সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধারকর্তা হিসেবে প্রথম মহীপালের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন।

৩। প্রথম মহীপালের রাজ্যসীমা নির্ধারণপূর্বক প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে তাঁর স্থান নিরূপণ করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। Abdul Momin Chowdhury, *Dynastic History of Bengal.*

২। R.C. Majumdar, *History of Ancient Bengal.*

৩। আবদুল মমিন চৌধুরী ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস।*

৪। রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১ম খন্ড।

পাঠ - ৩

পাল সাম্রাজ্য ঃ অবনতি, পুনরুদ্ধার ও বিলুপ্তি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- বৈদেশিক আক্রমণে পাল সাম্রাজ্যের অবনতি সম্পর্কেজানতে পারবেন ;
- উত্তর বাংলার 'সামন্ত বিদ্রোহ' সম্পর্কে তথ্য পাবেন ;
- রামপালের নেতৃত্বে 'বরেন্দ্র পুনরুদ্ধার সম্পর্কেজানবেন।

প্রথম মহীপালের পর তাঁর পুত্র নয়পাল ১৫ বছর (আনুঃ ১০৪৩-১০৫৮খ্রিঃ) রাজত্ব করেন। নয়পালের পর মহীপালের পৌত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল ১৬ বছর (আনুঃ ১০৫৮-১০৭৫খ্রিঃ) রাজত্ব করেন।তাঁদের রাজত্ব কালের প্রধান ঘটনা ছিল কলচুরিরাজ লক্ষ্মীকর্ণের উপর্যুপরি আক্রমণ। তিব্বতী গ্রন্থ হতে জানা যায়, কর্ণ প্রথমে মগধ আক্রমণ করে নয়পালকে পরাজিত করেন। তবে শেষ পর্যন্ত নয়পাল কর্ণকে পরাজিত করেন এবং বিখ্যাত বৌদ্ধ আচার্য অতীশ দীপঙ্করের মধ্যস্থতায় বিরোধের মীমাংসা হয়। তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে কর্ণ দ্বিতীয়বারের মত পাল সাম্রাজ্য আক্রমণ করে জয়লাভ করেন। বীরভূম জেলার পাইকোরে প্রাপ্ত কর্ণের শিলাস্তম্ভলিপি হতে মনে করা হয় যে, তিনি পাল সাম্রাজ্যের কিছু অংশ অধিকার করেছিলেন। সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত 'রামচরিত' গ্রন্থে বিগ্রহপালের বিজয়ের কথা এবং বিগ্রহপাল কর্তৃক কর্ণের কন্যা যৌবনশ্রীকে বিবাহ করার উল্লেখ করেছে। এতে ধারণা করা হয় যে, বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে বিরোধের সমাপ্তি ঘটেছিল।

কলচুরি সূত্র হতে জানা যায় যে, কর্ণ বঙ্গের রাজাকেও পরাজিত করেন। সম্ভবত পালদের বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জন করে কর্ণ পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার চন্দ্রবংশীয় শেষ রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করেন এবং চন্দ্র শাসনের অবসান ঘটান। কর্ণের এই বিজয় দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় পাল শাসন বিস্তারের পথ সুগম করে। সম্ভবতঃ দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে প্রকাশিত বাঘাউড়া ও নারায়ণপুর লিপির আলোকে অনুমান করা হয় যে, কর্ণের আক্রমণের পর বিগ্রহপালের সাথে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পাল শাসন দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বিস্তার লাভ করে। তবে এ অঞ্চলে পাল শাসন বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।

কলচুরি আক্রমণ ছাড়াও পাল সাম্রাজ্য কল্যাণের চালুক্য বংশের আক্রমণের শিকার হয়েছিল। চালুক্য লিপিমালায় বংশীয় রাজা প্রথম সোমেশ্বর, দ্বিতীয় সোমেশ্বর ও ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের শাসনকালে একাধিকবার গৌড় আক্রমণের উল্লেখ আছে। বিল্হন রচিত 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত' গ্রন্থেও বিক্রমাদিত্য কর্তৃক গৌড় রাজ্য আক্রমণের উল্লেখ আছে। এসব প্রমাণ হতে অনুমান করা হয় ১০৪২-১০৭৬ খ্রিঃ-এর মধ্যে চালুক্য রাজ কর্তৃক পাল সাম্রাজ্য একাধিকবার আক্রান্ত হয়েছিল।

পাল রাজাদের দুর্বলতার সুযোগে উড়িষ্যার রাজগণও বাংলা আক্রমণ করেন। একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সোম বংশীয় রাজা মহাশিবগুপ্ত যযাতি গৌড় ও রাঢ় জয় করেন এবং রাজা উদ্যোতকেশরী গৌড়ের সৈন্যদলকে পরাজিত করেন বলে লিপিতে প্রমাণ আছে। একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কামরূপরাজ রত্নপালও বাংলা আক্রমণ করেছিলেন বলে মনে করা হয়।

সুতরাং বলা যায়, নয়পাল ও বিগ্রহপালের রাজত্বকালে পাল সাম্রাজ্য চারদিক থেকে আক্রান্ত হয়েছিল। এই অবস্থা তাদের দুর্বলতার কথাই প্রমাণ করে।

দ্বিতীয় মহীপাল ও সামন্ড় বিদ্রোহ

বিগ্রহপালের পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিতীয় মহীপাল পাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি প্রায় পাঁচ বছর (আনু ১০৭৫-১০৮০ খ্রি:) রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা ছিল উত্তর বাংলার সামন্ত বিদ্রোহ। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' কাব্যে এই বিদ্রোহ ও বিদ্রোহোত্তর ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু দ্ব্যর্থবোধক এই কাব্যের শ্লোকসমূহ হতে অন্তর্নিহিত ঐতিহাসিক তথ্য উদ্‌ঘাটন খুব সহজসাধ্য নয়। এমনকি শ্লোকসমূহের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করাও কঠিন। আমাদের সৌভাগ্য যে, কবির জীবিতাবস্থায় বা অল্পকাল পরে এই কাব্যের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৩৫ শ্লোক পর্যন্ত টীকা রচিত হয়েছিল। এই টীকা থাকায় সমসাময়িক ঘটনা সম্বন্ধীয় অর্থ অনেকাংশে বোঝা সহজ হয়েছে। বাকি যে অংশের টীকা নেই, সে অংশের শ্লোকসমূহ ব্যাখ্যা করা কঠিন। তবে টীকার সাহায্য নিয়ে বরেন্দ্র বিদ্রোহ ও রামপাল কর্তৃক বরেন্দ্র পুনরুদ্ধার সম্বন্ধে বিস্তারিত জানা যায়।তবে সন্ধ্যাকর নন্দীর বর্ণনায় রামপালের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

দ্বিতীয় মহীপালের সিংহাসন আরোহণের সাথে সাথে তাঁর অন্য দুই ভ্রাতা দ্বিতীয় শূরপাল ও রামপালকে তিনি কারারুদ্ধ করেছিলেন। মহীপাল অহেতুক সন্দেহ করেছিলেন যে, ভ্রাতৃদ্বয় তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। দুর্বল পাল সাম্রাজ্যে উত্তরাধিকার নিয়ে বিবাদ ও ষড়যন্ত্র স্বাভাবিক ঘটনা হলেও সন্ধ্যাকর নন্দীর বর্ণনা থেকে মনে হয়, বরেন্দ্রে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল তা মহীপালের অন্যায় আচরণ অর্থাৎ নিছক অহেতুক সন্দেহের বশে ভ্রাতৃদ্বয়কে কারারুদ্ধ করারই ফল। মহীপালের পর্যাপ্ত সমরসজ্জা না থাকলেও তিনি মন্ত্রীবর্গের পরামর্শ উপেক্ষা করে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। যুদ্ধে মহীপাল পরাজিত ও নিহত হন এবং কৈবর্ত প্রধান দিব্য বরেন্দ্র (উত্তর বাংলা) অধিকার করে সেই অঞ্চলের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

সামন্ড় বিদ্রোহের ফলে বরেন্দ্র অঞ্চলে পাল শাসনের বিলুপ্তি ঘটলেও এই বিদ্রোহের কারণ, উৎপত্তি ও প্রকৃতি নির্ণয় করা কঠিন। এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। কেউ মনে করেন, অত্যাচারী মহীপালের রাজত্বে বিরাজমান অসন্তোষের মধ্যে দিব্য স্বজাতীয় কৈবর্ত প্রজাদের নিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই বিদ্রোহকে ধর্মীয় প্রকৃতি দান করে কেউ কেউ মন্তব্য করেন যে, মৎস্যজীবী কৈবর্তদেরকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজারা সামাজিক নির্যাতনের বশবর্তী করেছিল। মহীপালের রাজত্বের শুরুতে তাঁর ভ্রাতৃদ্বয়কে কারারুদ্ধ করার ফলে যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল সেই সুযোগে দিব্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং মহীপালকে হত্যা করেন। অনেকে আবার এরূপ মন্তব্য করেন যে, রামপাল সর্বসম্মত রাজা বলে বিবেচিত হলেও মহীপাল জ্যেষ্ঠত্বের দাবিতে পাল সিংহাসন অধিকার করেন। ফলে রামপালের পক্ষে সমর্থনকারীদের উত্থানই এই বিদ্রোহের কারণ। কিন্তু এই মত তেমন গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা এই বিদ্রোহের ফলে রামপাল তাঁর রাজ্যের কেন্দ্রস্থল হারিয়েছিলেন। সুতরাং এই বিদ্রোহের সাথে রামপাল বা তাঁর সমর্থনকারীদের কোন সম্পর্ক ছিল না।

রামচরিত কাব্যের বিভিন্ন শ্লোক হতে এই বিদ্রোহের উৎপত্তি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা যায়। মহীপালের সঙ্গে বিদ্রোহীদের যুদ্ধের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে রামচরিতের টীকাকার উল্লেখ করেছেন যে, এই যুদ্ধ ছিল 'মিলিত অনন্ত সামন্ত চক্র'-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ। কিন্তু এই মিলিত সামন্তচক্রে কারা ছিল তার কোন উল্লেখ করেননি। রামচরিতের একটি শ্লোকে ইঙ্গিত আছে যে, দিব্য মহীপালের অধীনে উচ্চ রাজকর্মে নিযুক্ত ছিলেন। কাব্যগ্রন্থে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, দিব্য মহীপালের মৃত্যুর পর বরেন্দ্রভূমি দখল করেন। সুতরাং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দিব্য মিলিত সামন্তচক্রের সাথে জড়িত ছিলেন বলে মনে হয়। রামচরিতে দিব্যকে 'উপধিব্রতী' বলা হয়েছে। টীকাকার একে অবশ্য কর্তব্য পালনে ভানকারী বা 'ছদ্মনিব্রতী' বলে বর্ণনা করেন।এই বর্ণনা হতে মনে হয়, দিব্য বরেন্দ্র অধিকার করেছিলেন এই ভান বা ছলনা করে যে, রাজকর্মচারী হিসেবে অবশ্যকর্তব্যবোধ থেকেই তিনি রাজার পক্ষেই বরেন্দ্র অধিকার করেছেন।কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাঁর স্বাধীনতা ঘোষণায় বিদ্রোহকারী সামন্তচক্রের সাথে তার গোপন সম্পর্ক প্রকাশ পায়।

সুতরাং বলা যায়, দ্বিতীয় মহীপাল সিংহাসনে আরোহণের পর তাঁর ভ্রাতৃদ্বয়ের ষড়যন্ত্রের ধারণার বশবর্তী হয়ে তাদেরকে কারারুদ্ধ করলে বাহ্যিকভাবে পাল শাসনের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। এই সুযোগে উত্তর বাংলার সামন্তরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। বিদ্রোহী সামন্তচক্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মহীপালের মৃত্যু হয় এবং দিব্য বরেন্দ্র অধিকার করে স্বশাসন প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তর বাংলায় দিব্য ও তাঁর বংশের শাসন বেশ কিছুদিন প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিদ্রোহী সামন্তচক্রের সাথে দিব্যের সম্পর্ক থাকাই স্বাভাবিক, তা না হলে বিদ্রোহীদের সাফল্য দিব্যের ক্ষমতা দখলে কেন সাহায্য করবে। রাজকর্মচারী দিব্যের এইরূপ আচরণ সন্ধ্যাকর নন্দীর দৃষ্টিতে ছিল 'ধর্মবিপ্লব'। রাজকর্মচারীর 'ধর্ম' বিচ্যুতির অর্থেই 'ধর্ম বিপ্লব' শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় মহীপালের পর তাঁর ভ্রাতা দ্বিতীয় শূরপাল সিংহাসনে বসেন। তিনি সীমিত পাল সাম্রাজ্যে অর্থাৎ মগধ ও পশ্চিম বাংলার অংশ বিশেষে রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বকালের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তিনি আনুমানিক ১০৮০ খ্রিঃ হতে ১০৮২ খ্রিঃ পর্যন্ত দুই বছর রাজত্ব করেন।

রামপাল ও বরেন্দ্র পুনরুদ্ধার

দ্বিতীয় শূরপালের পর রামপাল পাল বংশের রাজা হন। লিপি প্রমাণে বলা যায় তিনি ৪২ বছর (আনুঃ ১০৮২-১১২৪ খ্রিঃ) রাজত্ব করেন। রাজত্বের প্রথম দিকে তাঁর রাজ্য বিহার ও পশ্চিম বাংলার অংশবিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল।বিহারে রামপালের শাসনকালের বহু লিপির প্রমাণ রয়েছে।পশ্চিম বাংলাও যে তাঁর অধিকারে ছিল সে বিষয়ে পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

রামপাল রাজ্যভার গ্রহণ করেই বরেন্দ্র (উত্তর বাংলা) অঞ্চল পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকে কৈবর্ত প্রধান দিব্য তাঁর বিরুদ্ধে সাফল্যজনক আক্রমণ চালিয়েছিলেন। ফলে রামপাল নিজ সামরিক শক্তি বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দেন। সৈন্য সংগ্রহ ও সাহায্যের জন্য তাঁর অধীনস্ত সামন্তদের অর্থ ও সম্পত্তির প্রলোভন দেখিয়ে তিনি সামন্তদের সাহায্য লাভ করেন। বরেন্দ্র পুনরুদ্ধারে রামপাল যেসকল সামন্ত রাজের সাহায্য নিয়েছিলেন তাদের অধিকাংশই পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অংশে রাজত্ব করতো। পশ্চিম বাংলায় তাঁর আধিপত্য দুর্বল ছিল বলেই তিনি ঐসব সামন্ত রাজের কাছে অত্যন্ত বিনীতভাবে সাহায্য ভিক্ষা করেছিলেন, এ থেকে মনে হয় সেসময় কেন্দ্রীয় সরকারের চাইতে সামন্তদেরই দাপট বেশি ছিল।

যেসব সামন্ত রাজারা রামপালকে সাহায্য করেছিলেন রামচরিতে তাঁদের নাম পাওয়া যায়। টীকাকারের ব্যাখ্যা হতে তাঁদের অনেকের রাজ্যের অবস্থিতি সম্বন্ধেও ধারণা করা যায়। যেমন– মগধের অধিপতি ভীমযশ, কোটাটবীর (বাকুরার অন্তর্গত কোটেশ্বর) বীরগুণ, দন্ডভুক্তির (মেদিনীপুর) রাজা জয়সিংহ, দেবগ্রামের রাজা বিক্রমরাজ, অরণ্য প্রদেশস্থ অপরমন্দারের (হুগলী জেলার মন্দারণ) লক্ষ্মীশূর, কুঞ্জবটির (সাঁওতাল পরগণা) শূরপাল, তৈলকম্পের রুদ্রশিখর, উচ্ছালের ভাস্কর বা ময়গলসিংহ, চেক্করীরাজ (বর্ধমান) প্রতাপসিংহ, কযঙ্গল মন্ডলের (কজঙ্গল) নরসিংহার্জুন, সংকট গ্রামের চন্ডার্জুন, নিদ্রাবলীর রাজা বিজয়রাজ, কৌশাম্বীর দ্বোরপবর্ধন প্রমুখ। এ সকল সামন্তরাজা ছাড়াও রামপালের প্রধান সহায়ক ছিলেন তাঁর মাতুল রাষ্ট্রকূটকুলতিলক মথন বা মহন। তিনি তাঁর দুই পুত্র কাহণরদেব ও সুবর্ণদেব এবং ভ্রাতুষ্পুত্র শিবরাজকে সঙ্গে নিয়ে রামপালকে সাহায্য করতে এসেছিলেন। রামপালের নির্দেশে প্রথমে শিবরাজ এক সৈন্যদল নিয়ে সম্ভবত গঙ্গানদীর তীরে ভীমের সীমান্তবর্তী ঘাঁটিসমূহ বিধ্বস্ত করে দেন।রামপালের নেতৃত্বে মূল সৈন্যবাহিনী দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা হতে বরেন্দ্র আক্রমণ করলে ভীমের সাথে এক তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। রামচরিতের নয়টি শ্লোকে এই যুদ্ধের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যুদ্ধে রামপাল ও ভীম উভয়েই বিশেষ পারদর্শিতা দেখালেও হঠাৎ ভীম বন্দী হন। এতে ভীমের সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লে হরি নামক ভীমের এক সুহৃদ সৈন্যদলকে পুনরায় একত্রিত করে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু রামপাল স্বর্ণকলস ভর্তি উপঢৌকনের মাধ্যমে হরিকে নিজের দলভুক্ত করে ভীমের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন।

পিতৃভূমি বরেন্দ্র পুনরুদ্ধার করে রামপাল পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোতে প্রভাব বিস্তার করে পাল সাম্রাজ্যের লুপ্ত গৌরব উদ্ধারের চেষ্টা করেন। রামচরিতে বলা হয়েছে, পূর্বদেশীয় বর্মরাজ উত্তর বাংলায় রামপালের সাফল্যে ভীত হয়ে পড়েন এবং নিজ রাজ্যকে রামপালের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে উপঢৌকন প্রেরণের মাধ্যমে পালরাজার তুষ্টি ও বন্ধুত্ব আদায় করেন। বর্মরাজ কর্তৃক তুষ্টিসাধনকে পালরাজার আনুগত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ ধরা যায়।

রামচরিতে রামপালের মিত্ররাজা কর্তৃক পার্শ্ববর্তী রাজ্য কামরূপ জয়ের উল্লেখ রয়েছে। কামরূপ বা কামরূপ রাজ্যের অংশবিশেষ যে পাল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল তার প্রমাণ বৈদ্যদেবের কমৌলি তাম্রশাসনেও রয়েছে।

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দক্ষিণ হতে গঙ্গা রাজগণ কর্তৃক উপর্যুপরি উড়িষ্যা আক্রমণের সুযোগে রামপাল সামন্ত দন্ডভুক্তির অধিপতি জয়সিংহ উৎকলরাজ কর্ণকেশরীকে পরাজিত করেন এবং নিজের মনোনীত একজনকে উৎকলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। রামচরিত অনুসারে রামপাল উৎকল জয় করে কলিঙ্গদেশ পর্যন্ত পাল সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটান।

কলচুরিরাজ লক্ষীকর্ণের মৃত্যুর পর ১০৯০ খ্রিস্টাব্দে উত্তর ভারতীয় গাহড়বাল বংশ বারাণসী ও কান্যকুব্জ অধিকার করে পাল সাম্রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত নিজেদের রাজ্যের প্রসার ঘটান। তাঁদের লিপি হতে জানা যায়, গাহড়বাল রাজা মদনপালের রাজত্বকালে (১১০৪-১১১১ খ্রিঃ) তাঁর পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের সাথে রামপালের যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধে গোবিন্দচন্দ্র পাল সাম্রাজ্যের কোন অংশ অধিকার করেছিলেন কিনা সে বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই। হয়তো রামপাল স্বরাজ্য সংরক্ষণে সক্ষম হয়েছিলেন। গোবিন্দচন্দ্রের স্ত্রী ছিলেন রামপালের মাতুল মহনের দৌহিত্রী। সম্ভবত এই বৈবাহিক মৈত্রী কিছু সময়ের জন্য দুই বংশের বিরোধিতার অবসান ঘটিয়েছিল। তবে রামপালের মৃত্যুর পর পাল সাম্রাজ্যের অনেকটুকু গাহড়বাল রাজ্যভুক্ত হয়েছিল।

বরেন্দ্র বহুদিন কৈবর্ত শাসনে থাকার পর সে অঞ্চলে রামপাল পালশাসনের পুন:প্রতিষ্ঠা করে সেখানকার শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। তিনি কৃষির উন্নতি ও করভার লাঘবের প্রয়াস চালান। এরপর রামপাল রামাবতী (মালদহের নিকটবর্তী) নামক এক নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। এটি পরবর্তী সময়েও পাল সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল।

অগ্রজ দুই ভ্রাতার পর রামপাল বেশ প্রৌঢ় অবস্থায় সিংহাসনে আরোহণ করেন। তথাপি তাঁর রাজত্বকাল ছিল নিঃসন্দেহে সাফল্যপূর্ণ। শাসনকালের প্রথমদিকে সীমিত সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েও পুনরায় উত্তর বাংলাকে পাল সাম্রাজ্যভুক্ত করে তিনি শৌর্য-বীর্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। রামপালের রাজত্বের শুরুর তুলনায় শেষদিকে পালশক্তির যে উন্নতি লক্ষ করা যায় তা তাঁরই কৃতিত্ব। এই কৃতিত্বের জন্যই তিনি পাল বংশের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর রাজত্বকালে পাল সাম্রাজ্য শেষবারের মতো উন্নতির শিখরে পৌঁছেছিল।তাঁর মৃত্যুর পর এই সাম্রাজ্য দ্রুত গতিতে বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যায়। তাই রামপালকে পালবংশের শেষ 'মুকুটমণি' বলা হয়।

প্রথম মহীপালের পরবর্তী প্রায় একশত বছর পাল সাম্রাজ্য বহি:শত্রুর আক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে ক্রমশ: দুর্বল হয়ে পড়ে। এমনকি ধীরে ধীরে অবনতি ও বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যায়। পরবর্তীকালে পাল রাজাদের মধ্যে একমাত্র রামপালই কিছু শৌর্য-বীর্যের পরিচয় দেন এবং পাল বংশের অবনতির গতিকে ক্ষণকালের জন্য হলেও রোধ করতে সক্ষম হন।কিন্তু রামপালের পর বিলুপ্তিকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি। দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগের কোন এক সময়ে সুদীর্ঘ চারশত বছরের পাল শাসনের অবসান ঘটে।

মদনপালই সম্ভবত শেষ পাল সম্রাট। তবে বাংলার ভূ-ভাগ থেকে বিতাড়িত হওয়ার পরও কিছুদিন পাল রাজ্য বিহারের অংশবিশেষে টিকে ছিল। পলপাল ও গোবিন্দপাল নামক রাজা– যাদের লিপি বিহারে পাওয়া গিয়েছে তাঁরা পাল বংশের কিনা তা সঠিক করে বলা যায় না।

সারসংক্ষেপ

নয়পাল ও বিগ্রহপালের রাজত্বকালে পাল সাম্রাজ্যের দুর্বলতা প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় মহীপালের সময় উত্তর বাংলায় দেখা দেয় সামন্ত বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহে বরেন্দ্র অঞ্চলে পাল শাসনের বিলুপ্তি ঘটে। রামপাল বরেন্দ্র পুনরুদ্ধারে তৎপর হন। তৎকালীন শক্তিশালী সামন্তদের সাহায্য নিয়ে তিনি পালদের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হন। রামাবতী নামক স্থানে তিনি রাজধানী স্থাপন করেন। রামপালকে পাল বংশের শেষ 'মুকুটমণি' বলা হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে কোন এক সময়ে সুদীর্ঘ পাল শাসনের অবসান ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা–

(ক) ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব (খ) কম্বোজদের সামরিক বিজয়

(গ) বরেন্দ্র বিদ্রোহ (ঘ) জনহিতকর কার্যাবলী।

২। উত্তর বাংলার বিদ্রোহ দমন করেন–

(ক) প্রথম মহীপাল (খ) দ্বিতীয় মহীপাল

(গ) রামপাল (ঘ) শূরপাল।

৩। বরেন্দ্র বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন–

(ক) কলচুরি রাজা কর্ণ (খ) চন্দ্ররাজা গোবিন্দচন্দ্র

(গ) উৎকলরাজ কর্ণকেশরি (ঘ) কৈবর্ত প্রধান দিব্য।

৪। বরেন্দ্র বিদ্রোহের নেতাকে রামচরিত কাব্যে বলা হয়েছে–

(ক) উত্তরপথস্বামী (খ) উপধিব্রতী

(গ) সকলোত্তর পথনাথ (ঘ) মুকুটমণি।

৫। পাল বংশের শেষ 'মুকুটমণি' কে?

(ক) প্রথম মহীপাল (খ) দ্বিতীয় মহীপাল

(গ) রামপাল (ঘ) মদনপাল।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। বৈদেশিক আক্রমণে পাল সাম্রাজ্যের অবনতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। দিব্য সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালেসংঘটিত 'বরেন্দ্র বিদ্রোহ' সম্পর্কে আলোচনা করুন। এই বিদ্রোহের উৎপত্তি সম্বন্ধে 'রামচরিত' কাব্যে কী ব্যাখ্যা পাওয়া যায়?

২। বরেন্দ্র পুনরুদ্ধারে রামপালের ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।

৩। পাল বংশের শেষ 'মুকুটমণি' হিসেবে রামপালের কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১ম খন্ড।

২। R.C. Majumdar, *History of Ancient Bengal.*

৩। Abdul Momin Chowdhury, *Dynestic History of Bengal.*

৪। আবদুলমমিন চৌধুরী ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস।*

পাঠ - ৪

পাল যুগের গৌরব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- পালদের সামরিক ও প্রজা-বৎসল শাসন কৃতিত্ব সম্পর্কে জানবেন;
- পাল যুগে গৃহীত ধর্মীয় সম্প্রীতির নীতি সম্পর্কে জানতে পারবেন ;
- পাল শিল্পরীতির উৎকর্ষ বিষয়ে অবহিত হবেন ;
- পাল যুগের সাহিত্যিক অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা পাবেন ;
- পাল যুগের গৌরব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

পাল যুগ প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে গৌরবময় অধ্যায়। পাল বংশ প্রায় চারশত বৎসর বাংলা শাসন করে। একই রাজবংশের এতো দীর্ঘকালের শাসন ইতিহাসে বিরল।এই দীর্ঘ শাসনকালের মধ্যে চড়াই-উৎড়াই লক্ষ করা যায় বটে, কিন্তু বিপর্যয়ের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে পাল রাজারা তাঁদের শাসন অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই দীর্ঘ শাসনে বাংলার কৃতিত্ব অবশ্যই পাল যুগের গৌরব। বিস্তৃত সাম্রাজ্য, সাম্রাজ্যে সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা, প্রজাবৎসল শাসন-নীতি, বিভিন্ন শিল্পকলার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধন এবং সাহিত্য ও জ্ঞান চর্চা– এ সবই পাল যুগের কৃতিত্ব ও গৌরব।

পালবংশের শাসন প্রতিষ্ঠার পর উদীয়মান প্রতিপত্তির যুগে পাল সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। সমগ্র উত্তর ভারত তাঁদের শাসনাধীনে না আসলেও কনৌজ পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করে পাল শক্তি উত্তর ভারতের রাজনীতিতে দৃঢ় পদক্ষেপের চিহ্ন রাখতে সমর্থ হয়েছিলো নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধে। পালদের অধীনেই উত্তর ভারতের রাজনীতিতে বাংলার প্রথম সাফল্যজনক বিস্তৃতি ঘটে। বাংলার রাজবংশগুলোর মধ্যে এই গৌরবের দাবি কেবল পালরাই করতে পারেন।স্বল্পকালের জন্য হলেও পালরাই বাংলার আঞ্চলিক শক্তিকে উত্তর ভারতীয় শক্তিতে পরিণত করেছিলো। অবশ্য উত্তর ভারতে পালদের প্রতিপত্তি দীর্ঘকাল বজায় থাকেনি। তবে একথা বলতেই হয় যে, পাল শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে যে শক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল তা দীর্ঘকাল ধরে পাল সাম্রাজ্যকে উত্তর ভারতীয় শক্তিবলয়ে প্রভাব বিস্তার করতে সামর্থ এবং দশম-একাদশ শতাব্দীতে বিভিন্ন উত্তর ভারতীয় শক্তির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সাফল্যজনক প্রতিরোধ গড়ে তোলার মতো শক্তি দিয়েছিল। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, দশম ও একাদশ শতাব্দীতে উত্তর ভারতীয় শক্তিগুলোর আগ্রাসনে পাল সাম্রাজ্য আক্রান্ত হয়েছে বেশ কয়েকবার, কিন্তু প্রতিবারই প্রতিরোধ করার ক্ষমতা পালদের ছিল। বহিঃশত্রুর আক্রমণে পাল সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হয়নি। সুতরাং শশাঙ্কের পর সামরিক ক্ষেত্রে শৌর্যবীর্যের প্রদর্শন ও শক্তি সঞ্চারের কৃতিত্ব পালদেরই।

পালদের সামরিক কৃতিত্বের চাইতে অধিকতর প্রশংসনীয় কৃতিত্ব তাঁদের সাম্রাজ্যে বিরাজমান সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা। পালদের তাম্রশাসনসমূহে সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রাম পর্যায় থেকে কেন্দ্রীয় সরকার পর্যন্ত স্তরীভূত সুবিন্যস্ত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল পাল সাম্রাজ্যে। তবে একথা বলা ঠিক হবে না যে, এই শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের একক কৃতিত্ব পালদের। গুপ্ত শাসনাধীন বাংলায় এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। তবে পালদের কৃতিত্ব এই যে, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ব্যবস্থাকে

তাঁরা করে তুলেছিলেন অনেক বেশি কার্যকর।যোগ করেছিলেন অনেক নতুন বৈশিষ্ট্য। রাজস্ব ছাড়াও বিভিন্ন কর ও শুল্ক আদায়ের এবং ভূমি প্রশাসনের ছিল সুবিন্যস্ত অবকাঠামো।তাম্রশাসনসমূহে রাজকর্মচারীদের যে দীর্ঘ তালিকা পাওয়া যায় তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, প্রশাসনব্যবস্থা ছিল সর্বব্যাপী, খেয়াঘাটের ব্যবস্থা থেকে শুরু করে নদীপথ, স্থলপথ, ব্যবসা-বাণিজ্য, নগর-বন্দর, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা– কোন ক্ষেত্রই প্রশাসন যন্ত্রের আওতাবহির্ভূত ছিল না। এমনকি বন এবং বাজার ব্যবস্থাপনার দিকেও নজর ছিল প্রশাসনের। পালদের অব্যাহত চার শতাব্দীকাল শাসনের মূল ভিত্তিই ছিল তাঁদের সুষ্ঠু ও সুবিন্যস্ত শাসনব্যবস্থা।

বাংলায় দীর্ঘ পাল শাসনের সবচেয়ে গৌলবোজ্জ্বল দিক তাঁদের প্রজা-বৎসল শাসননীতি। পাল সম্রাটগণ ছিলেন বৌদ্ধ, কিন্তু প্রজাদের অধিকাংশ ছিল হিন্দু। পাল সম্রাট ধর্মপাল ধর্মীয় সম্প্রীতির নীতি গ্রহণ করেছিলেন রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি সকল শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞাত এবং যাতে সব ধর্ম-বর্ণ তাদের কার্যকলাপ বজায় রাখতে পারে সেদিকে তিনি তৎপর থাকবেন। প্রজাদের ধর্ম-কর্ম সম্পর্কে সচেতনতার এই ঘোষণা দীর্ঘ পাল শাসনামলে অনুসৃত হয়েছিল বলেই মনে হয়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, পাল সম্রাটগণ বৌদ্ধ হওয়া সত্তেও হিন্দু দেব-দেবতা বা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় সম্রাটদের অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে।রাজকীয় উচ্চপদসমূহে অধিষ্ঠিত দেখা যায় ব্রাহ্মণদের।ধর্মপালের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ এবং এই মন্ত্রী পরিবার তিন পুরুষ ধরে পাল রাজাদের শাসনের সাথে জড়িত ছিল। রাজাদের যতগুলো ভূমিদান সংক্রান্ত তাম্রশাসন আজ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে তার দুএকটি ছাড়া সবকয়টিতেই দান লাভ করেছে হিন্দু দেব-দেবতার মন্দির বা ব্রাহ্মণ।পাল সম্রাট ধর্মপাল ভূমিদান করেছিলেন নারায়ণের উপাসনার জন্য।নারায়ণপাল, প্রথম মহীপাল এবং নয়পাল পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন শৈব সন্ন্যাসীদের আর স্থাপন করেছিলেন শৈব মন্দির, যেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাঁরা ভূমিদান করেছিলেন। প্রথম মহীপাল বারাণসীর পশুপত গুরু শ্রীবামরাশীর ভক্ত ছিলেন আর তাঁর পায়ে আরাধনা করতে বারাণসীতে গিয়েছিলেন। বাংলার জনজীবনে হিন্দু-বৌদ্ধের মধ্যে কোন ভেদাভেদ ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সহাবস্থান পাল যুগের সমাজ জীবনে বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

দীর্ঘ শাসনকালে এই সামাজিক সম্প্রীতি পাল যুগকে অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনে অবশ্যই সাহায্য করেছিল। পাল সম্রাটদের প্রজাহিতৈষণারও দৃষ্টান্ত রয়েছে। পাল সম্রাট ধর্মপাল বহু সহস্র দ্রম্ম (রৌপ্য মুদ্রা) খরচ করে খনন করেছিলেন কয়েকটি দীঘি। সম্রাট প্রথম মহীপালের বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে দীঘি খনন ও নগর প্রতিষ্ঠা সর্বজনবিদিত। বাংরার জনমনে যে তিনি স্থায়ী আসন করে নিয়েছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।বহুল প্রচলিত প্রবাদবাক্য 'ধান ভানতে শিবের গীত' পরিণত হয়েছিল 'ধান ভানতে মহীপালের গীত'-এ।তাছাড়া পাল সম্রাটদের জনস্বার্থে বহু নির্মাণের ধ্বংসাবশেষ তাঁদের কল্যাণমুখী শাসনের পরিচয় বহন করে। বাংলার জনজীবনে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার যে ঐতিহ্য পাল যুগে সৃষ্টি হয়েছিল সেন যুগে তা বিঘ্নিত হওয়ার ফলেই হয়তো পরবর্তীকালে বাংলার সমাজ জীবনে ইসলামের গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছিল। বাংলার ধর্মজীবনে হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের যে ধারা সুদীর্ঘ পাল শাসনামলে সূচিত হয়েছিল, সৃষ্টি হয়েছিল সহজিয়া ও তান্ত্রিক মতাদর্শের, তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব বাংলার জনজীবনে পরিলক্ষিত হয় মধ্যযুগ পেরিয়ে আধুনিক যুগেও। বলা যায় বাংলার ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতিতে যে সমন্বয়ের ঐতিহ্য পাল যুগে সৃষ্টি হয়েছিল, তা বাংলার এক শাশ্বত অর্জন, গর্ব করার মতো অর্জন। এই অর্জনকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে প্রাচীন বাংলার 'ব্যক্তিত্ব'।

পাল যুগে বৌদ্ধ ধর্ম প্রসার লাভ করেছিল তিব্বত, জাভা, সুমাত্রা ও মালয়েশিয়াতে।বাংলার বৌদ্ধবিহারগুলো থেকে বহু বৌদ্ধ পন্ডিত ঐসব দেশে গিয়ে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার এবং প্রসারে ভূমিকা রেখেছিলেন।

পাল যুগের গৌরবের সবচেয়ে উজ্জ্বল দিক শিল্পকলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে। শিল্পকলার মাধ্যমেই প্রকাশ ঘটে যুগের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অভিব্যক্তির। স্থাপত্য, পোড়ামাটির ফলক, ভাস্কর্য আর চিত্রকলায় পাল যুগের বিশেষ কৃতিত্ব পরিলক্ষিত হয়। পাল সম্রাট ধর্মপালের স্থাপত্য কীর্তির নিদর্শন পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহার। বাংলায় উদ্ভাবিত বৌদ্ধ-বিহার স্থাপত্য পরিকল্পনায় নির্মিত এই বিহারটির ধ্বংসাবশেষ সগৌরবে ঘোষণা করছে স্থাপত্যশিল্পে বাংলার উৎকর্ষ অর্জনের কথা। এ ভারতীয় উপমহাদেশে সর্ববৃহৎ বৌদ্ধ বিহার। বর্গাকার ক্ষেত্র, প্রতি বাহু প্রায় এক হাজার ফুট, চারদিকে বৌদ্ধ শ্রমণদের অসংখ্য আবাসকক্ষ, আর প্রাঙ্গণের মাঝে ক্রুসাকৃতির ক্রমশ হ্রাসমান অবয়বে দাঁড়িয়ে থাকা কেন্দ্রীয় মন্দির বা উপাসনা সৌধ। আজ ধ্বংসস্তুপের মধ্যেও এ স্থাপত্যকীর্তি অবলোকনকারীকে আকর্ষণ করে, এর বিশালতা কিছুটা অবাক করে। বিপুলশ্রীমিত্রের নালন্দালিপিতে এটিকে 'জগতাম্ নেত্রৈকবিশ্রাম ভূ' (জগতের চোখে তৃপ্তিদায়ক বা দৃষ্টিনন্দন) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে উদ্‌ঘাটিত প্রত্নস্থলটি বর্তমানে ইউনেস্কোর অর্থানুকূল্যে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত হচ্ছে।এই বিহারের স্থাপত্য পরিকল্পনা, বিশেষ করে এর কেন্দ্রীয় সৌধটি, নিকটবর্তী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মায়ানমার ও ইন্দোনেশিয়ায় প্রভাব ফেলেছিল বলে বিশ্লেষকগণ মনে করেন।এই পরিকল্পনা অনুসরণ করে মায়ানমারে ও ইন্দোনেশিয়াতে ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে কয়েকটি বৌদ্ধ স্থাপত্য গড়ে উঠেছিল।

পাহাড়পুরে প্রাপ্ত অসংখ্য পোড়ামাটির ফলক পাল যুগে এই শিল্পের উৎকর্ষের প্রমাণ বহন করে। দেয়াল গাত্রালংকারে ব্যবহৃত এই ফলকসমূহ বাংলার মৃৎশিল্পীদের অনন্য সৃষ্টি বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। ধর্মীয় বিষয়বস্তু ছাড়াও এই ফলকসমূহে স্থান পেয়েছে বাংলার জনজীবনের অনেক দৃশ্য। তাই শৈল্পিক মূল্য ছাড়াও ইতিহাসের উপকরণ হিসেবে এদের মূল্য অপরিসীম। পাহাড়পুরের ফলকসমূহ শৈল্পিক গুণগত মানে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। বাংলার এই ঐতিহ্যবাহী শিল্প যে পাল যুগে উৎকর্ষের উচ্চ শিখরে উঠেছিল সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

পাহাড়পুর ছাড়াও পাল যুগের অনেক কীর্তি বাংলা-বিহারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। বিক্রমশিল বিহার (বিহারের ভাগলপুর জেলায় পাথরঘাটায় অবস্থিত) ও ওদন্তপুর বিহার ধর্মপালের কীর্তি। বৌদ্ধ ধর্মচর্চা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার জন্য সোমপুর মহাবিহার ও বিক্রমশিল বিহার নবম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী সময়ের মধ্যে বৌদ্ধ বিশ্বে সমাদৃত হয়েছিল। বিক্রমশিল বিহারে বিভিন্ন বিষয়ে ১১৪ জন অধ্যাপক ছিলেন এবং তিব্বত থেকে বহু বিদ্যার্থী এখানে শিক্ষালাভের জন্য আসতো।পালযুগের অন্যান্য বিহারের মধ্যে ত্রৈকুটক, দেবিকোট, পন্ডিত, ফুল্লবাড়ি ও জগদ্দল বিহারের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সূত্র ধরে একথাও বলা যায় পাল সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ ধর্মচর্চা, বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা বাংলার বিভিন্ন কেন্দ্রে এতো প্রসার লাভ করেছিল যে তদানীন্তন বিশ্বে বাংলার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। নিকটবর্তী ও দূরবর্তী বহু দেশ থেকে বিদ্যার্থীরা বাংলায় আসতো। জাভা-সুমাত্রার শৈলেন্দুবংশীয় রাজা বালপুত্রদেবের অনুরোধে পাল সম্রাট দেবপাল পাঁচটি গ্রাম দান করেছিলেন নালন্দায় অধ্যয়নরত ঐ দেশীয় বিদ্যার্থীদের মঠের ব্যয় নির্বাহের জন্য।পাল যুগের বৌদ্ধ বিহারগুলো পার্শ্ববর্তী নেপাল, তিব্বত, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের ক্ষেত্রেও মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। বাংলার বৌদ্ধপন্ডিতবর্গ দূরদূরান্তে বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিস্তার ঘটিয়েছেন। এঁদের মধ্যে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

পাল যুগের কোন হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়নি। তবে বাংলার বিভিন্ন জায়গায় মন্দিরে ব্যবহৃত স্তম্ভ বা দ্বারের অংশবিশেষে, ভাস্কর্যে মন্দিরের প্রতিকৃতি প্রভৃতি থেকে অনুমান করা সম্ভব যে পালযুগে মন্দির স্থাপত্যেরও ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল এবং স্থাপত্যশিল্পের উৎকর্ষ এক্ষেত্রেও সাধিত হয়েছিল।

পাল যুগের শিল্পকলার মধ্যে ভাস্কর্য শিল্পের প্রভূত অগ্রগতি ঘটেছিল। গুপ্ত ভাস্কর্যের ধারাবাহিকতায় পাল সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার ভাস্কর্য শিল্পে এ যুগে এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করে, যাকে আখ্যায়িত করা হয়েছে 'পাল স্কুল অব স্কাল্পচারাল আর্ট' বলে। সপ্তম শতাব্দীর পর থেকেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে

ভাস্কর্যশিল্পে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। বাংলাতেও পাল যুগে ভাস্কর্যশিল্প স্থানীয় বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। যার অগ্রগতি দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। পাল যুগের অসংখ্য প্রস্তর মূর্তি বাংলার বিভিন্ন এলাকায় পাওয়া গিয়েছে। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন যাদুঘরে প্রধান দ্রষ্টব্য বস্তুই অসংখ্য মূর্তি। রাজমহলের কালো কষ্টি পাথরই ছিল ভাস্কর্যের প্রধান মাধ্যম। ভাস্কর্যের শিল্প সাধনায় প্রস্তরখন্ড যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বাংলার ভাস্কর্য শিল্প স্থান করে নিয়েছিল সর্বভারতীয় শিল্পকলার আসরে। পাল যুগেরই যেন পরিপূর্ণতা পেয়েছিল বাংলার দীর্ঘকালের শিল্পপ্রতিভা। প্রস্তর মূর্তির পাশাপাশি ধাতব মূর্তির সংখ্যাও কম নয়। মূর্তি নির্মাণে পিতল এবং ব্রোঞ্জ (অষ্টধাতু) ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলার ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শিল্পরীতিতে প্রভাব ফেলেছিল বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

চিত্রকলার ক্ষেত্রেও পাল যুগ পিছিয়ে ছিল না। পালযুগের পূর্বের কোন চিত্রকলার নিদর্শন বাংলাতে পাওয়া যায়নি। মন্দির বা ধর্মীয় স্থাপত্যের অলংকরণে দেয়ালচিত্রেরও কোন নিদর্শন আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে রচিত লামা তারনাথের গ্রন্থে পাল সম্রাট ধর্মপাল ও দেবপালের রাজত্বকালের দুই বিখ্যাত ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী, ধীমান ও তাঁর ছেলে বীটপালের উল্লেখ রয়েছে। একাধারে প্রস্তর ও ধাতু নির্মিত ভাস্কর্যে এবং চিত্রশিল্পে তাঁরা ছিলেন পারদর্শী। বজ্রযান ও তন্ত্রযান বৌদ্ধমতের বহু পান্ডুলিপিতে বৌদ্ধ দেব-দেবতার রূপ চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। দশম শতাব্দীর শেষভাগ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত সময়ের ২৪টি চিত্রিত বৌদ্ধ পান্ডুলিপি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে; যেমন- 'পঞ্চরক্ষা', 'অষ্টসাহস্রিক প্রজ্ঞাপারমিতা', 'পঞ্চবিংশতিসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' ইত্যাদি বৌদ্ধ গ্রন্থ। আর এসব পান্ডুলিপির চার শতাধিক চিত্রের মধ্যেই বিধৃত রয়েছে পাল যুগের চিত্রকলা। কেবল পান্ডুলিপি চিত্রের মধ্যেই পাল যুগের চিত্রকলার পরিচয় সীমাবদ্ধ হলেও, গুণগত মানে তা শিল্পের উৎকর্ষের কথাই প্রমাণ করে। পরবর্তীকালের, এমনকি চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্ব ভারতীয়, নেপালী এবং তিব্বতী চিত্রকলায় পাল যুগের চিত্রকলার প্রভাব লক্ষ করেছেন চিত্রকলার বিশেষজ্ঞগণ।

সাহিত্য ক্ষেত্রে পাল যুগের কৃতিত্বের প্রকৃত মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়, কারণ এ যুগের রচনা খুব বেশি সংখ্যায় আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি। যে দুএকটি এসে পৌঁছেছে, তা থেকেই বোঝা যায় যে, সাহিত্য ক্ষেত্রেও প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। তবে পাল যুগের প্রাপ্ত অসংখ্য তাম্রশাসনে বিধৃত 'প্রশস্তি' অংশে সংস্কৃত ভাষা চর্চার ও শৈল্পিকমান সম্পন্ন কাব্য রচনার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। নবম শতাব্দীর কবি অভিনন্দ কর্তৃক বৈদর্ভী রীতিতে রচিত 'রামচরিতম্' মহাকাব্য সর্ব–ভারতীয় সাহিত্যাসরে সমাদৃত হয়েছিল। শেষ পাল সম্রাট মদনপালের রাজত্বকালে সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হয়েছিল বরেন্দ্রের কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতম্' কাব্য। কবি এক বিরল কাব্যরীতি অনুসরণ করে এই দ্ব্যর্থবোধক কাব্যটিতে একদিকে বাল্মিকীর রামায়ণের কাহিনী অন্যদিকে পাল সম্রাট রামপালের কাহিনীকে এক করে প্রকাশ করেছেন। ভাষার সৌকর্য, বিশেষ অর্থবহ শব্দের প্রয়োগ এবং ছন্দের মাধুর্যে সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতম্' কাব্যটি সর্বভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে বেশ ওপরের সারিতেই। সেন যুগে সংকলিত কাব্য সংকলনগুলোর মধ্যে দশম-একাদশ শতাব্দীর বেশ কয়েকজন কবির রচনা স্থান পেয়েছে। কাব্যিক মানে উচ্চ পর্যায়ের বলেই এই রচনাসমূহ সংকলনে স্থান পেয়েছে। আর এ কাব্য সম্ভার পাল যুগের সাহিত্যের উৎকর্ষেরই প্রমাণ বহন করে।

এ যুগে বিভিন্ন শাস্ত্র সম্বন্ধীয় লেখনিরও প্রমাণ পাওয়া যায়। দর্শন শাস্ত্রের মূল্যবান গ্রন্থ 'আগমশাস্ত্র' নামে বহুল পরিচিত 'গৌড়পাদকারিকা' রচনা করেছিলেন গৌড়পদ, বর্ধমানের ভূরিশ্রেষ্টী গ্রামের শ্রীধর ভট্ট রচনা করেছিলেন 'ন্যায়কন্ডলি', বীরভূমের সিদ্ধল গ্রামের ভট্ট ভবদেব রচনা করেছিলেন 'কর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি'। স্মৃতি শাস্ত্রেও ভবদেবের খ্যাতি ছিল। পাল সম্রাট নয়পালের কর্মচারী নারায়ণ দত্তের পুত্র চক্রপাণি দত্ত চিকিৎসা শাস্ত্রের বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন– 'চিকিৎসা সংগ্রহ', 'আয়ুর্ব্বেদীপিকা', 'ভানুমতী', 'শব্দ চন্দ্রিকা' ও 'দ্রব্য গুণসংগ্রহ'। দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রণীত চিকিৎসা শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'শব্দ প্রদীপ'–এর গ্রন্থকার সুরেশ্বর ছিলেন পাল রাজপরিবারের চিকিৎসক, তাঁর পিতা ভদ্রেশ্বর ছিলেন সম্রাট রামপালের

চিকিৎসক।সুরেশ্বরের অন্যান্য রচনা 'বৃক্ষায়ুর্বেদ' এবং 'লোহপদ্ধতি' বা 'লোহসর্বস্ব'।'চিকিৎসা সার সংগ্রহ'-এর প্রণয়নকারী বঙ্গসেব ও 'সুশ্রুত' শাস্ত্রের ব্যাখ্যাদানকারী গদাধরবৈদ্য পাল যুগের বলেই মনে করা হয়।ধর্মশাস্ত্রে অবদান রেখেছিলেন জীমূতবাহন তাঁর 'দায়ভাগ', 'ব্যবহার-মাতৃকা' ও 'কালবিবেক' গ্রন্থত্রয়ের মাধ্যমে। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর কোন সময়ে রাঢ়ের পারিভদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম। ওপরে উল্লেখিত গ্রন্থরাজি পাল যুগের সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

উপসংহারে তাই বলা চলে যে, পাল শাসনের দীর্ঘ চার শতাব্দীকাল বাংলার জন্য বয়ে এনেছিল অনেক কৃতিত্ব। এই কৃতিত্বের গৌরব যেমন একদিকে শাসকগোষ্ঠীর তেমনি অন্যদিকে জনগণের। প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে তাই পাল শাসন শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার।

সারসংক্ষেপ

পাল যুগ প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে গৌরবময় অধ্যায়। বিস্তৃত সাম্রাজ্য, সাম্রাজ্যে সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা, প্রজাবৎসল শাসননীতি, বিভিন্ন শিল্পকলার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধন এবং সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চা– সর্বক্ষেত্রে এ যুগের অগ্রগতি ও সাফল্য উল্লেখযোগ্য। পালদের ধর্মীয় সম্প্রীতির নীতি রীতিমতো দৃষ্টান্তমূলক। এ যুগে বাংলার জনজীবনে হিন্দু-বৌদ্ধদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ ছিল বলে জানা যায় না। বিশেষ করে বাংলার ধর্ম সমাজ-সংস্কৃতিতে এ যুগে সমন্বয়ের যে ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছিল তা বাংলার এক শাশ্বত অর্জন।এ যুগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে বাংলার বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক দৃঢ় হয়। শিল্পকলার ক্ষেত্রে বাংলার নিজস্ব রীতি বিকশিত হয়। আর সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এ যুগের উৎকর্ষ উল্লেখ করার মতো। সবমিলিয়ে বাংলার নিজস্ব 'ব্যক্তিত্ব' গঠনে পাল যুগের অবদান অবিস্মরণীয় এবং বাংলার ইতিহাসে পাল শাসন নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পালদের দীর্ঘ শাসনের মূল ভিত্তি ছিল–
   (ক) সুষ্ঠু ও সুবিন্যস্ত শাসনব্যবস্থা (খ) সুদৃঢ় মুদ্রা অর্থনীতি
   (গ) বঙ্গীয় শিল্পরীতি সৃষ্টি (ঘ) ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় নীতি।

২। কোন পালরাজা দিঘি খনন ও নগর প্রতিষ্ঠার জন্য প্রসিদ্ধ?
   (ক) ধর্মপাল (খ) প্রথম মহীপাল
   (গ) দ্বিতীয় মহীপাল (ঘ) দেবপাল।

৩। কোন প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলক পাল শিল্পের উৎকর্ষের প্রমাণবাহী?
   (ক) চন্দ্রকেতুগড় (খ) ময়নামতি
   (গ) পাহাড়পুর (ঘ) মহাস্থান।

৪। কোনটি পাল যুগের বিহার নয়?
   (ক) বিক্রমশীল বিহার (খ) সোমপুর বিহার
   (গ) ওদন্তপুর বিহার (ঘ) শালবন বিহার।

৫। কোন গ্রন্থে পালযুগের বিখ্যাত ভাস্কর চিত্রশিল্পীদের উল্লেখ আছে?
   (ক) লামা তারনাথের গ্রন্থে (খ) বিদ্যাকরের গ্রন্থ
   (গ) শ্রীধরদাসের গ্রন্থে (ঘ) সন্ধ্যাকরনন্দীর গ্রন্থে।

৬। 'শব্দপ্রদীপ' রচয়িতা কে?

(ক) সুরেশ্বর (খ) চক্রপানি দত্ত
(গ) জীমূতবাহন (ঘ) গৌড়পাদ।

৭। 'দায়ভাগ' রচনা করেছেন–
(ক) গৌড়পাদ (খ) চক্রপানিদত্ত
(গ) জীমূতবাহন (ঘ) সুরেশ্বর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। পাল শাসকদের গৃহীত ধর্মীয় সম্প্রীতি নীতি সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।
২। শিল্পকলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পালযুগের উৎকর্ষের বিবরণ দিন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। সামরিক কৃতিত্ব এবং শাসন ব্যবস্থার অগ্রগতির নিরিখে পালযুগের মূল্যায়ন করুন।
২। শিল্পকলা এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে পালযুগের কৃতিত্ব পর্যালোচনা করুন।
৩। প্রাচীন বাংলার 'ব্যক্তিত্ব' গঠনে পাল যুগের অবদান মূল্যায়ন করুন।
৪। পাল যুগের গৌরব বিষয়ে একটি নিবন্ধ রচনা করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। R.C Majumdar, *History of Ancient Bengal.*
২। A.M. Chowdhury, *Dynastic History of Bengal.*
৩। আবদুল মমিন চৌধুরী ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস।*
৪। রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ।*
৫। নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব।*

পাঠ - ৫

দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা: দেব ও চন্দ্র শাসন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার পৃথক রাজনৈতিক অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা পাবেন ;
- দেব রাজবংশের ইতিহাস জানতে পারবেন ;
- চন্দ্রদেব বংশানুক্রমিক ইতিহাসের ধারাবাহিক চিত্র পাবেন ;
- দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার শ্রেষ্ঠ নৃপতি শ্রীচন্দ্রের কৃতিত্ব সম্পর্কে তথ্য পাবেন।

সাম্প্রতিককালে প্রাপ্ত বিভিন্ন তাম্রশাসন ও লিপি প্রমাণের ভিত্তিতে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার ইতিহাস পুনর্গঠন সম্ভব। গুপ্ত যুগের পর থেকে সেন বংশের উদ্ভব পর্যন্ত বাংলার এ অঞ্চল যে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে পৃথক ছিল তার সাক্ষ্য মেলে এই উপাদানগুলোতে। প্রাপ্ত তথ্যসমূহে সপ্তম শতাব্দী থেকে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় কিছু শক্তিশালী রাজবংশের শাসন পরিলক্ষিত হয় যা এ অঞ্চলের একটি পৃথক রাজনৈতিক সত্তার পরিচয় বহন করে। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ছয়টি তাম্রশাসনে বঙ্গে গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব নামক তিনজন রাজার নাম পাওয়া যায়। খালিমপুর তাম্রশাসন ও আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পের ভিত্তিতে সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় ভদ্র রাজবংশের অবস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। এছাড়া একই শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে সমতট অঞ্চলে শাসনকারী রাজবংশ হিসেবে খড়্গদের উল্লেখ পাওয়া যায়। খড়্গদের পর অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে এ অঞ্চলে শাসন করে দেবরাজবংশ।এছাড়া লিপিমালায় হরিকেল অঞ্চলে দেব শাসনের পরপরই এক ভিন্ন রাজবংশের কথা জানা যায়।অধুনাপ্রাপ্ত ঐতিহাসিক উপাদানে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজবংশ হিসেবে প্রমাণ মেলে চন্দ্র রাজবংশের। চন্দ্ররা এ অঞ্চলে দেড়শ' বছর (দশম শতাব্দীর শুরু থেকে একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত) রাজত্ব করেছিলো বলে জানা যায়। এ যাবত প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে এ ধারণা স্পষ্ট হয় যে, সপ্তম শতাব্দী থেকে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা বিভিন্ন রাজবংশের শাসনামলে বাংলার অন্যান্য অঞ্চল হতে পৃথক রাজনৈতিক অস্তিত্ব নিয়ে বিকাশ লাভ করেছিল।

'দেব' রাজবংশ

দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় খড়্গ রাজবংশের শাসনের পর অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে দেবরাজবংশের উদ্ভব হয়। তিনটি তাম্রশাসন ও কিছু মুদ্রা থেকে বাংলার ইতিহাসে দেবরাজবংশের অবস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়, পূর্বে যা ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। প্রাপ্ত তাম্রশাসনগুলোর মধ্যে দুটি এবং কিছু মুদ্রা পাওয়া যায় কুমিল্লার ময়নামতি-লালমাই অঞ্চলের শালবন বৌদ্ধ বিহারে। ১৯৫১ সালে ডি.সি. সরকার কর্তৃক প্রকাশিত তৃতীয় তাম্রশাসনটি 'কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল'-এ সংরক্ষিত রয়েছে। ময়নামতিতে প্রাপ্ত অপর একটি তাম্রশাসনে রাজা শ্রী আনন্দদেব কর্তৃক ভূমিদান এবং তাঁর পরবর্তী রাজা শ্রীভবদেব কর্তৃক উক্ত ভূমিদান অনুমোদনের প্রমাণও পাওয়া যায়। দেবরাজাদের ভূমিদান সংক্রান্ত এসব তাম্রশাসনে এই বংশের চার পুরুষের নামের উল্লেখ রয়েছে। তাঁরা হলেন শ্রীশান্তিদেব, শ্রীবীরদেব, শ্রী আনন্দদেব ও শ্রীভবদেব।

এরা প্রত্যেকেই পরমসৌগত, পরমভট্টারক, পরমেশ্বর এবং মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেন। আর এই উপাধি তাঁদের সার্বভৌমত্বেরই পরিচয় প্রদান করে।

দেব রাজারা দেবপর্বত নামক স্থানে তাঁদের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেছিলো।রাজা শ্রীভবদেবের একটি তাম্রশাসনেও এর উল্লেখ রয়েছে। ভবদেবের তাম্রশাসন, শ্রীধারণ রাটের কৈলান তাম্রশাসন এবং শ্রীচন্দ্রের সিলেট তাম্রশাসনে দেবপর্বতের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা হতে মনে হয় কুমিল্লার লালমাই পাহাড়েই এর অবস্থান ছিল। শ্রীধারণ রাটের কৈলান তাম্রশাসনের মাধ্যমে জানা যায় দেবপর্বত 'ক্ষিরোদা' নদীর তীরে অবস্থিত। আধুনিক কালে এই 'ক্ষিরোদা' কুমিল্লা শহরের পশ্চিম পাশ দিয়ে প্রবাহিত গোমতি নদীর শাখা 'ক্ষীরনাই' নদী হিসেবে চিহ্নিত। এই চিহ্নিতকরণ থেকে বলা যায় যে, দেবপর্বত নগরী কুমিল্লার ময়নামতি এলাকাতেই অবস্থিত ছিল এবং একে কেন্দ্র করেই দেবরাজারা তাঁদের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।

দেব রাজাদের রাজ্যসীমা নির্ধারণ করা কঠিন। তবে উপর্যুক্ত লিপি প্রমাণের ভিত্তিতে এ কথা বলা যায় যে, দেবরাজাগণ সমতট অঞ্চলেই তাঁদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।অবশ্য এই সমতট অঞ্চল ছিল নোয়াখালী-ত্রিপুরা পর্যন্ত বিস্তৃত। লিপি প্রমাণের ভিত্তিতে জানা যায় যে, আনন্দদেব ও ভবদেব উভয়ই পেরানটন বিষয়ে ভূমিদান করেছিলেন।আর এই পেরানটন-এর অবস্থান ছিল কুমিল্লা-নোয়াখালী অঞ্চলে। দেবরাজাদের রাজ্যসীমা সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলা না গেলেও এটি প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা প্রভুত্ব স্থাপন করেছিলো প্রাচীন বাংলার সমতট অঞ্চলে।

দেবরাজাদের রাজত্বকাল সম্পর্কেও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। তবে অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে খড়্গ রাজবংশের পরই দেবরা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার সমতট অঞ্চলে তাঁদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলায় যে সময় পালবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় সে সময় দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা দেবরাজবংশের শাসনাধীন ছিল।দেবরাজাগণ বিভিন্ন সময় ভূমিদান সংক্রান্ত তাম্রশাসন উৎকীর্ণ করেন। ভবদেবের ময়নামতি তাম্রশাসনগুলোর একটি উৎকীর্ণ হয় তাঁর রাজত্বের দ্বাদশ বৎসরে। তাই দেববংশের চারপুরুষের শাসনের যথাযথ কাল নির্ধারণ করা না গেলেও আনুমানিক তাঁরা একত্রে ৫০-৬০ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন বলে বলা যায়। যেহেতু দেবরা খড়্গদের পরবর্তী এবং পাল রাজাদের সমসাময়িক, তাই ৭৫০-৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় সমতটে তাঁদের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে অনুমান করা যায়। এছাড়া তাঁদের শাসন ছিল নবম শতাব্দীর হরিকেল রাজাদের পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত। তাই তাম্রশাসন ও উৎকীর্ণ লিপি বিচারে বলা যায় যে, দেবরাজারা অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সমতট অঞ্চলে রাজত্ব করতেন।

দেবরাজাদের রাজনৈতিক কর্মকান্ড সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত।ময়নামতিতে প্রাপ্ত লিপিগুলোতে দেব রাজাদের যে বংশানুক্রম পাওয়া যায় তাতে শ্রী শান্তিদেবকে এই বংশের প্রথম রাজা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষিত তাম্রশাসনের প্রথম লাইনে বীরদেবকে দেববংশের প্রথম রাজা বলা হয়েছে।এতে শত্রুনিধনে বীরদেবের বিপুল শক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। এও বলা হয় যে, তিনি শত্রুদের সূর্যাস্তের অন্ধকারের ন্যায় ধ্বংস করতেন।এদিক থেকে তিনি বিষ্ণুর সাথে তুলনীয়।এই লিপিতে তাঁর পুত্র আনন্দদেবকে যুদ্ধক্ষেত্রে পিতার প্রতিকৃতি বলা হয়েছে।দেবরাজাদের তাম্রশাসনগুলো প্রায় ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁদের সম্বন্ধে বিস্তারিত জানা না গেলেও এগুলোর প্রশস্তিতে আনন্দদেব ও ভবদেবকে এ রাজবংশের অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজারূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। ময়নামতি এলাকায় প্রত্ন খননের মাধ্যমে আবিষ্কৃত শালবন বিহার ভবদেবের কীর্তি।আনন্দদেবের কীর্তি আনন্দ বিহার। অধুনা আবিষ্কৃত ভোজ বিহারও এ বংশের কোন এক রাজারই কীর্তি হবে বলে অনুমান করা হয়। তাছাড়া ময়নামতি এলাকার অন্যান্য বৌদ্ধ সংস্কৃতির নিদর্শনাদি দেব বংশেরই সমৃদ্ধশালী শাসনের পরিচয় বহন করে। রাজধানী 'দেবপর্বত'-এর সন্নিকটেই রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠেছিল বৌদ্ধ সংস্কৃতির কেন্দ্র। যদিও দেবপর্বতকে সঠিকভাবে এখনও সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি, তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এইসব পুরাকীর্তির আশেপাশেই ছিল এর অবস্থান।

হরিকেল রাজ্য

নবম শতাব্দীতে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার হরিকেল অঞ্চলে (যা চট্টগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী এলাকা বলে ধরা হয়) কয়েকজন স্বাধীন রাজার শাসনের প্রমাণ পাওয়া যায়। চট্টগ্রামে প্রাপ্ত শ্রীকান্তিদেবের একটি অসম্পূর্ণ তাম্রশাসন থেকে রমেশচন্দ্র মজুমদার এই তথ্য উপস্থাপন করেন। এতে বৌদ্ধ রাজপরিবারের তিন পুরুষের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন– ভদ্রদত্ত, তাঁর পুত্র ধনদত্ত এবং ধনদত্তের পুত্র কান্তিদেব। এদের মধ্যে কেবল কান্তিদেব সম্পূর্ণ রাজকীয় উপাধি ধারণ করেন। তিনি রাজত্বের উত্তরাধিকার তাঁর মাতার পিতার নিকট থেকে পেয়েছিলেন বলে মনে করা হয়। কারণ, তাঁর মাতা বিন্দুবতীকে 'মহারাজার কন্যা' বলা হয়েছে।নবম শতাব্দীতে বা দেব রাজবংশের পরবর্তীকালে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার হরিকেল অঞ্চলে কান্তিদেবের শাসন বিপুল প্রভাব বিস্ড়ার করেছিল।

তথ্যের বিভিন্নতার কারণে এই হরিকেল অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণ করা কঠিন। পন্ডিতগণ শ্রীহট্ট বা বর্তমান সিলেটকে এবং সাম্প্রতিককালে চট্টগ্রাম অঞ্চলে হরিকেল-এর অবস্থান বলে মনে করেন। তবে কেউ কেউ একে বঙ্গের সাথে অভিন্ন বলেও মত প্রকাশ করেন। এমনও হতে পারে যে, হরিকেল রাজ্যের রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে রাজ্যের ব্যপ্তিও বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজা কান্তিদেবের রাজধানীর নাম ছিল বর্ধমানপুর। তবে এর অবস্থান সঠিকভাবে নির্ধারণ করা কঠিন।

উল্লেখিত আলোচনার ভিত্তিতে একথা বলা যায় যে, হরিকেল এবং বর্ধমানপুরের অবস্থান যেখানেই হোক না কেন নবম শতাব্দীতে কান্তিদেবসহ কতিপয় রাজা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় শাসন করেছিলেন।

চন্দ্ররাজবংশ

বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত তাম্রশাসনসমূহ হতে বর্তমানে চন্দ্রবংশের ইতিহাস পুনর্গঠন সম্ভব। ময়নামতিতে প্রাপ্ত তিনটি, ঢাকায় প্রাপ্ত একটি ও সিলেটের পশ্চিমভাগে প্রাপ্ত একটি তাম্রশাসন থেকে এখন এই বংশের শাসন সম্পর্কে বিস্তারিত জানা হয়েছে। পূর্বে বেশ কয়েকটি তাম্রশাসন হতে শ্রীচন্দ্র প্রমুখ কয়েকজন রাজার নাম জানা গেলেও বিস্তারিত ইতিহাস জানা সম্ভব ছিল না।আর তাই দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার এই শক্তিশালী রাজবংশের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণা না থাকায় এ অঞ্চলের ইতিহাস উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলার ইতিহাসের সাথে অভিন্ন বলে মনে করে সাধারণভাবে সারা বাংলায় পাল বংশীয় শাসন প্রবর্তিত ছিল বলে মনে করা হতো। বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অনেকাংশে স্পষ্ট।

লিপিমালা ও অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে চন্দ্ররাজাদের রাজত্বকাল ও বংশানুক্রমিক নির্ণয় করা সম্ভব। তাঁদের বংশতালিকা ও বিভিন্ন রাজাদের শাসনকালে প্রাপ্ত লিপি হতে তাঁদের রাজত্বের যে ধারাবাহিক কাল নির্ণয় সম্ভব তা হলো–

পূর্ণচন্দ্র
সুবর্ণচন্দ্র
ত্রৈলোক্যচন্দ্র– রাজত্বকাল জানা যায়নি
শ্রীচন্দ্র– ৪৪ বছর
কল্যাণচন্দ্র– ২৪ বছর
লড়হচন্দ্র– ১৮ বছর
গোবিন্দচন্দ্র– ২৩ বছর

চন্দ্রবংশের উল্লেখিত রাজাদের মধ্যে শেষ চারজন মোটামুটিভাবে ১১০–১১৫ বছরব্যাপী শাসনকার্য পরিচালনা করেন। কেবলমাত্র রাজা গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বের যথাযথ কাল নির্ণয় করা সম্ভব হয় লিপি

প্রমাণের মাধ্যমে। রাজেন্দ্রচোলের তীরুমুলাই লিপিতে গোবিন্দচন্দ্রকে বঙ্গালদেশের রাজা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং এতে বলা হয়েছে যে– তিনি পাল রাজা প্রথম মহীপালের সমসাময়িক। এই তথ্যের ভিত্তিতে এবং 'শব্দপ্রদীপ' নামক চিকিৎসাশাস্ত্রের একটি গ্রন্থ থেকে তাঁর রাজত্বের দ্বিতীয়ার্ধ সম্পর্কেও জানা যায়। এতে করে তাঁর রাজত্বের মোট সময়কাল ধরা যায় ১০২০–১০৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময়কালের ওপর ভিত্তি করে গোবিন্দচন্দ্রের পূর্বের রাজাদের যে রাজত্বকাল নির্ধারণ করা যায় তা হলো–

শ্রীচন্দ্র	-	৯৩০–৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ
কল্যাণচন্দ্র	-	৯৭৫–১০০০ খ্রিস্টাব্দ
লড়হচন্দ্র	-	১০০০–১০২০ খ্রিস্টাব্দ

ত্রৈলোক্যচন্দ্রের রাজত্বকালের কোন লিপি প্রমাণ পাওয়া না গেলেও তিনি স্ব-বংশীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে জানা যায়। আর তাই তাঁর রাজত্বকাল ৯০০–৯৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল বলে অনুমেয়। তবে উপরোল্লেখিত তথ্যের ভিত্তিতে এই কাল নির্ণয় সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল নাও হতে পারে। তথাপি একথা বলা যায় যে, আনুমানিক দশম শতাব্দীর প্রারম্ভিক কাল হতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় চন্দ্রবংশীয় রাজাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল।

তাম্রশাসনে বিধৃত তথ্যের ভিত্তিতে চন্দ্ররাজাদের ক্ষমতা আরোহণ সম্পর্কিত কিছু আভাষ পাওয়া যায়। তাম্রশাসনসমূহে এ বংশের প্রথম ভূ-পতি পূর্ণচন্দ্রকে রোহিতাগিরির ভূ-স্বামী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর পুত্র সুবর্ণচন্দ্রও একজন ভূ-স্বামী ছিলেন বলে মনে করা হয়। পূর্ণচন্দ্র ও সুবর্ণচন্দ্র সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে শ্রীচন্দ্রের ধুল্লা, রামপাল ও মদনপুর তাম্রশাসনে সুবর্ণচন্দ্রকে বৌদ্ধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত তিনিই চন্দ্ররাজাদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং পরবর্তী সব রাজাই ছিলেন বৌদ্ধ।

পন্ডিতগণ ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে চন্দ্র বংশের প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা হিসেবে মত প্রকাশ করেন। তবে প্রথমদিকে তিনি রোহিতাগিরির ভূ-স্বামী বা সামন্তরাজা ছিলেন। তাম্রশাসনে তাঁকে হরিকেল রাজার ক্ষমতার আধার বা প্রধান অবলম্বন বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই অবস্থান থেকে তিনি চন্দ্রদ্বীপের নৃপতি হয়েছিলেন। এ থেকে বলা যায় যে, ত্রৈলোক্যচন্দ্র প্রথমে হরিকেল রাজার অধীনে সামন্তরাজা ছিলেন এবং তিনি এতই ক্ষমতাশালী ছিলেন যে, তাঁকে হরিকেল রাজার প্রধান অবলম্বন হিসেবে মনে করা হতো। আর এ অবস্থা থেকেই তিনি হয়েছিলেন চন্দ্রদ্বীপের নৃপতি, যা ছিল তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ।

চন্দ্রদের আদি অবস্থান রোহিতাগিরির সনাক্তকরণ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ রোহিতাগিরিকে বিহারের রোহতাসগড় বলে মনে করেন। তবে নলিনীকান্ত ভট্টাশালীর মতবাদ অধিক যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। তিনি মত পোষণ করেন যে, রোহিতাগিরি কুমিল্লার লালমাই পাহাড়েই অবস্থিত ছিল। কুমিল্লার লালমাই অঞ্চলে চন্দ্রবংশীয় রাজারা প্রাথমিক পর্যায়ে হরিকেল রাজাদের অধীনে ভূ-স্বামী ছিলেন বলে মনে করা যেতে পারে। ক্রমে ক্রমে তাঁদের অবস্থার উন্নতি হয়। তাঁদের মধ্যে ত্রৈলোক্যচন্দ্র সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাধর হয়ে ওঠেন, যা তাঁকে হরিকেল রাজার শক্তির প্রধান অবলম্বন রূপে প্রতিষ্ঠা করে। একথা মনে করা যেতে পারে যে, কান্তিদেব বা তাঁর পরবর্তী কোন হরিকেল রাজার অধীনে কুমিল্লা অঞ্চলে চন্দ্রদের এই উত্থানের সূচনা। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের ক্ষমতা এত বেশি বিস্তৃতি লাভ করেছিল যে এক সময় তিনি চন্দ্রদ্বীপের নৃপতি হন। ক্রমান্বয়ে তিনি সমতট অঞ্চলে ক্ষমতা বিস্তার করেন এবং দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় স্ব-বংশীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনে ত্রৈলোক্যচন্দ্র কর্তৃক সমতট জয়ের উল্লেখ রয়েছে। পূর্ববর্তী দেবরাজাদের শাসনকেন্দ্র দেবপর্বত ছিল তাঁর ক্ষমতার উৎস এবং সে স্থানের সৈন্যদল নিয়েই তিনি সমতট অধিকার করেছিলেন বলেও মনে করা হয়।লড়হচন্দ্রের ময়নামতি তাম্রশাসনে উল্লেখিত হয়েছে যে, বঙ্গ ত্রৈলোক্যচন্দ্রের শাসনকালে অভ্যুন্নতিশালী ছিল। সুতরাং বলা যায় হরিকেল রাজার অধীনে সামন্তরাজার অবস্থান হতে সার্বভৌম ক্ষমতা লাভের নায়ক ছিলেন ত্রৈলোক্যচন্দ্র।

অন্যদিকে মুদ্রার ভিত্তিতে অনুমান করা যায় যে বাংলার এই চন্দ্রবংশীয় রাজারা আরাকানের চন্দ্রবংশীয় রাজাদের সাথে সম্পর্কিত ছিল। চট্টগ্রাম-কুমিল্লা অঞ্চলে আরাকানের প্রভাবের বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই একথা বলা যায় যে, চন্দ্রবংশীয় কোন এক ব্যক্তি কুমিল্লা অঞ্চলের ভূ-স্বামী হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে এ বংশেরই একজন শক্তিশালী শাসক দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। চট্টগ্রামে হরিকেল রাজ্যের অবস্থিতি এ অনুমানের পক্ষে সমর্থন যোগায়। তবে রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্রের উত্থান যেভাবেই হোক না কেন তিনিই চন্দ্রবংশের প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।

ত্রৈলোক্যচন্দ্র সম্বন্ধে প্রায় সব তাম্রশাসনে সাধারণভাবে প্রশংসা করা হয়েছে।কল্যাণচন্দ্রের ঢাকা তাম্রশাসনে ত্রৈলোক্যচন্দ্র কর্তৃক গৌড়দের পরাস্ত করার উল্লেখ রয়েছে। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের কোন তাম্রশাসন আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। সামন্তরাজা হিসেবে জীবন শুরু করে সমতট ও বঙ্গে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব।ত্রৈলোক্যচন্দ্র আনুমানিক ৯০০–৯৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণ পূর্ব বাংলায় সগৌরবে রাজত্ব করেন।

শ্রীচন্দ্র

চন্দ্র বংশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজা ছিলেন শ্রীচন্দ্র। তিনি ছিলেন পিতা ত্রৈলোক্যচন্দ্রের উত্তরাধিকারী। তাঁর নিজের এবং উত্তরসুরীদের তাম্রশাসনে শ্রীচন্দ্রকে একজন মহৎ রাজা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁর শাসনামলে চন্দ্রবংশের ক্ষমতা সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি সমগ্র পৃথিবীকে তাঁর ছাতার নিচে একীভূত করেছিলেন এবং তাঁর শত্রুদের করেছিলেন বন্দি। তিনি পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করে বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। আনুমানিক ৪৫ বছর তিনি দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় শৌর্যবীর্যের সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন।

শ্রীচন্দ্র উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন দক্ষিণ পূর্ব বাংলার শাসনভার। শ্রীহট্ট বা সিলেট অঞ্চল তাঁর শাসনাধীনে ছিল। তাঁর রাজত্বকালের পঞ্চম বৎসরে উৎকীর্ণ পশ্চিমভাগ তাম্রশাসন সিলেটে তাঁর ভূমিদানের পরিচয় বহন করে। তিনি আরো উত্তরপূর্বে কামরূপ রাজ্যে বিজয়াভিযান পরিচালনা করেছিলেন বলেও এই তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে। পার্শ্ববর্তী রাজ্য কামরূপ আক্রমণ ছিল তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কামরূপ বিজয়াভিযানে শ্রীচন্দ্রের সৈন্যদল লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র নদী অতিক্রম করে গৌহাটির অদূরবর্তী পার্বত্যাঞ্চল পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল বলে প্রশস্তিকার উল্লেখ করেন। এই তথ্যের সত্যতা যাচাই সম্ভব না হলেও বলা যায় কামরূপরাজ বলবর্মার পরবর্তীকালে রাজ্যে যে দুর্বল শাসন বিদ্যমান ছিল সে সুযোগে শ্রীচন্দ্রের সাফল্যজনক অভিযান খুব অস্বাভাবিক নয়। তবে কামরূপ রাজ্যের কোন অংশ বাংলার শাসনাধীনে এসেছিল কিনা তা বলা কঠিন। তদুপরি এ কথা বলা যায় যে, কামরূপের বিরুদ্ধে সাফল্যজনক অভিযান শ্রীচন্দ্রের অধীনে বাংলার শক্তি, শৌর্য ও বীর্যের পরিচয় বাহক।

লড়হচন্দ্রের ময়নামতি তাম্রশাসনে গৌড়ের বিরুদ্ধে শ্রীচন্দ্রের সাফল্যের কথা বলা হয়েছে। গৌড় এসময় কম্বোজ বংশীয় গৌড়পতিদের অধীন ছিল বলে মনে হয়। দ্বিতীয় গোপালের রাজত্বকালেই উত্তর-পশ্চিম বাংলা হতে পাল শাসন বিলুপ্ত হয়ে সেখানে কম্বোজবংশীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।সুতরাং শ্রীচন্দ্রের গৌড়ের বিরুদ্ধে সাফল্যই কম্বোজদের বিরুদ্ধে সাফল্য হওয়াটাই স্বাভাবিক।কল্যাণচন্দ্রের তাম্রশাসনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীচন্দ্র গোপালকে সিংহাসনে পুন:প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছিলেন।শ্রীচন্দ্রের সমসাময়িক পাল রাজা দ্বিতীয় গোপাল গৌড় হতে বিতাড়িত হয়েছিলেন। সুতরাং কম্বোজদের বিরুদ্ধে তাঁর সাফল্য গোপালের পুন:প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিল।তবে কম্বোজদের অধিকার সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়েছিল এমন মনে করা যায় না। এও হতে পারে যে, কাম্বোজদের উত্থানকালে গোপাল রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিলেন এবং শ্রীচন্দ্র কম্বোজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে গোপালকে সিংহাসনে পুন:প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিলেন। আর তা না হলে হয়তো সম্পূর্ণ পাল সাম্রাজ্যই কম্বোজদের হস্তগত হতো বা গোপাল নিজ অস্তিত্বই বজায় রাখতে

ব্যর্থ হতেন। এক্ষেত্রে মনে করা যেতে পারে সে, এক বৌদ্ধ রাজবংশ অন্য বৌদ্ধ রাজবংশের দুঃসময়ে সাহায্য করেছিল।

শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনে তাঁর অন্যান্য ক্ষেত্রেও সাফল্যের উল্লেখ রয়েছে। এ লিপিতে বলা হয়েছে যে, তিনি যমন বা যবন, হূণ ও উৎকলদের বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তবে এ উক্তিতে কতখানি সত্যতা রয়েছে বা উল্লেখিত জনপদগুলোর ওপর শ্রীচন্দ্রের আধিপত্য কতদূর বিস্তার লাভ করেছিল তা নির্ণয়ের উপায় নেই।

সমরক্ষেত্রে শ্রীচন্দ্রের সাফল্যের যে প্রমাণ আমরা লিপিমালা হতে পাই তা থেকে মনে হয় যে, শ্রীচন্দ্র চন্দ্র সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কামরূপ ও গৌড়ের বিরুদ্ধে তিনি সাফল্য অর্জন করেছিলেন। এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় শ্রীচন্দ্রের ভূমিকা অনেকাংশে পাল সাম্রাজ্যের ধর্মপালের ভূমিকার অনুরূপ বলে ধারণা করা যায়।

শ্রীচন্দ্রের শাসনকালের মোট ছয়টি তাম্রশাসন এ পর্যন্ত আবিষ্কার করা হয়েছে এবং এগুলো দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় তাঁর পরাক্রমশালী শাসনের পরিচয় বহন করে। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে ছিল তাঁর রাজধানী। ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমা, ঢাকা-ফরিদপুরের পদ্মা তীরবর্তী এলাকা, শ্রীহট্ট অঞ্চল ও কুমিল্লা-নোয়াখালীসহ সমতট অঞ্চল তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল একথা বলা যায় লিপি প্রমাণের ভিত্তিতে। সুতরাং প্রায় সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় চন্দ্র রাজবংশের শাসন এ সময় ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। ত্রৈলোক্যচন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ ও দৃঢ়ীকরণে শ্রীচন্দ্রের বলিষ্ঠ ভূমিকা সীমিত উপাদানসমূহ হতে পূর্ণাঙ্গ ও স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা সম্ভব না হলেও তিনি যে চন্দ্রবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন তা বিভিন্ন তাম্রশাসনে বিধৃত প্রশস্তিসমূহের সুর হতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

চন্দ্র শাসনের শেষ পর্যায়

শ্রীচন্দ্রের পর তাঁর পুত্র কল্যাণচন্দ্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি প্রায় ২৫ বছর অর্থাৎ আনুমানিক ৯৭৫–১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কল্যাণচন্দ্রের শাসনামলেও চন্দ্রদের শৌর্যবীর্য অক্ষুন্ন ছিল বলে মনে করা হয়। তাঁর রাজত্বকালের একটি মাত্র তাম্রশাসন পাওয়া যায়। তবে এই লিপিতে তাঁর নিজ রাজত্বকাল সম্বন্ধে বিস্তারিত কোন তথ্য পাওয়া যায় না। কল্যাণচন্দ্রের পুত্র এবং পৌত্রের তাম্রশাসনে তাঁর সম্বন্ধে জানা যায় যে, তিনি কামরূপের ম্লেচ্ছদের এবং গৌড়রাজকে পরাজিত করেছিলেন। তাঁর সমসাময়িক গৌড়রাজ কোন এক কাম্বোজ গৌড়পতি হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং এমনও হতে পারে যে, গৌড়রাজের বিরুদ্ধে তাঁর সাফল্য পরোক্ষভাবে পাল সম্রাট মহীপালকে সাম্রাজ্য পুনঃরুদ্ধারকার্যে সাহায্য করেছিল। পিতার ন্যায় তিনিও হয়তো পালরাজাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন এবং কম্বোজ গৌড়পতিদের ক্ষমতা খর্ব করে মহীপাল কর্তৃক পুনরুদ্ধারের পথ সুগম করেছিলেন।কল্যাণচন্দ্র সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা না গেলেও তাঁকে 'কলানিলয়' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এছাড়া তাঁকে দানে বলী, সত্যবাদিতায় যুধিষ্ঠিত ও বীরত্বে অর্জুনের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

লড়হচন্দ্র ছিলেন কল্যাণচন্দ্রের উত্তরাধিকারী। তিনি ১০০০–১০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। ময়নামতিতে প্রাপ্ত তাঁর দুটি তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, তিনি বাসুদেব বা বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভূমিদান করেছিলেন। লড়হচন্দ্র ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাঁর পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের একটি তাম্রশাসনে তাঁর বিদ্যানদী অতিক্রম, বারাণসীতে ধর্মীয়্লান এবং কবিত্ব ও পান্ডিত্যজনিত খ্যাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। বারাণসীতে গঙ্গাস্নানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ, বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভূমিদান ইত্যাদি তাঁর অন্য ধর্মের প্রতি উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় প্রদান করে। ভারেল্লায় তাঁর শাসনকালে নর্তেশ্বর শিবের যে মূর্তি পাওয়া গেছে তা হতে প্রমাণিত হয় যে, এই আকৃতিতে শিবের উপাসনা তখন থেকেই বাংলায় প্রচলিত ছিল। স্বাভাবিকভাবে মনে করা হতো এ ধরনের শিব উপাসনা সেন আমলে দাক্ষিণাত্য থেকে এসেছিল। কিন্তু সেন বংশের প্রায় এক শতাব্দী পূর্বেই এ ধরনের উপাসনার প্রচলন বাংলায় ছিল।

লড়হচন্দ্রের পর দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় শাসন করেছিলেন চন্দ্ররাজবংশের শেষ রাজা গোবিন্দচন্দ্র। গোবিন্দচন্দ্রের নাম পূর্বেই দুটি মূর্তিলিপি, তিরুমুলাই লিপি ও শব্দপ্রদীপ গ্রন্থ হতে জানা গিয়েছিল। কিন্তু ময়নামতিতে প্রাপ্ত গোবিন্দচন্দ্রের তাম্রশাসন তাঁর বংশ পরিচয় ও কালানুক্রম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করে। তিনি আনুমানিক ১০২০–১০৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় রাজত্ব করেছিলেন। গোবিন্দচন্দ্রের তাম্রশাসনে তাঁর অগাধ পান্ডিত্য ও গুণাবলীর কথা উল্লেখ রয়েছে এবং আশা পোষণ করা হয়েছে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তাঁর রাজত্বকে দীর্ঘস্থায়ী করবে। এ থেকে মনে হয় যে, এই তাম্রশাসন তাঁর রাজত্বের প্রারম্ভেই উৎকীর্ণ হয়েছিলেন।

সিংহাসনে আরোহণের স্বল্পকালের মধ্যেই তাঁকে দাক্ষিণাত্যের চোলরাজ রাজেন্দ্রচোলের আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই আক্রমণ তাঁর শক্তি অনেকাংশে হ্রাস করেছিল। এছাড়া গোবিন্দচন্দ্র কলচুরিরাজ কর্ণ কর্তৃক আক্রান্ত হন। এই দুই বৈদেশিক আক্রমণ চন্দ্ররাজার ক্ষমতা হ্রাস করে এবং তাঁদের শাসনের অবসান ঘটায়।

পিতা লড়হচন্দ্রের ন্যায় চন্দ্রবংশের শেষ রাজা গোবিন্দচন্দ্রেরও অন্য ধর্মের প্রতি উদার মনোভাবের পরিচয় মেলে। অনেকে চন্দ্রবংশীয় রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সাথে বাংলার বহুল প্রচলিত লোকগাঁথায় গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রকে অভিন্ন বলে মনে করেন। কিন্তু 'গোবিন্দচন্দ্রের গান', 'মানিকচন্দ্রের গান' প্রমুখ লোকগাঁথার সঠিক কাল নির্ণয় দুরূহ ব্যাপার। তাছাড়া সিংহাসন ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণকারী লোকগাঁথায় গোবিন্দচন্দ্রের যে পিতৃপরিচয় পাওয়া যায় তা চন্দ্রবংশীয় রাজার পিতৃপরিচয় হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুতরাং কেবলমাত্র নামের মিলের ওপর নির্ভর করে এ মতবাদ গ্রহণ করা যায় না।

গোবিন্দচন্দ্র ২৫ বছর দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় রাজত্ব করেন। একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় চন্দ্রবংশের শাসনের অবসান হয়। ধারণা করা হয় যে, এ সময় দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় পাল শাসন সম্প্রসারিত হলেও তা এ অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে উত্তর বাংলায় সামন্ত বিদ্রোহের সুযোগে এ অঞ্চলে বর্মরাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় প্রায় দেড় শতাব্দীকাল চন্দ্রবংশের শাসন বিরাজমান ছিল। ত্রৈলোক্যচন্দ্র ছিলেন এ বংশের ক্ষমতায় আরোহণের নায়ক, শ্রীচন্দ্রের রাজত্বকালে তাঁদের ক্ষমতা উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়। কল্যাণচন্দ্র ও লড়হচন্দ্রের শাসনকালেও তাঁদের গৌরব বজায় ছিল। কিন্তু গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বকালে বৈদেশিক আক্রমণের ফলে তাঁদের ক্ষমতা হীনবল হয়ে পড়ে এবং তাঁদের শাসনের সমাপ্তি ঘটে।

সারসংক্ষেপ

সপ্তম শতাব্দী থেকে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা পৃথক রাজনৈতিক অস্তিত্ব নিয়ে বিকাশ লাভ করে।ভদ্র,খড়্গ, দেব, চন্দ্র, বর্মণ ইত্যাদি রাজবংশ ধারাবাহিকভাবে এ অঞ্চলে রাজত্ব করে।দেবপর্বতে দেব রাজাদের রাজধানী স্থাপিত হয়।শালবন বিহার ভবদেবের কীর্তি আর আনন্দদেবের কীর্তি আনন্দবিহার। ৫০/৬০ বছর দেব রাজারা রাজত্ব করেন।চন্দ্র রাজারা রাজত্ব করেন প্রায় দেড়শ বছর।ত্রৈলোক্যচন্দ্র প্রথম গুরুত্বপুর্ণ চন্দ্র শাসক।তাঁরই পুত্র শ্রীচন্দ্র যে চন্দ্রবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা তা তাম্রশাসনে বিধৃত প্রশস্তিসমূহের মুর হতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়।কল্যাণচন্দ্র, লড়হচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের কালেও চন্দ্রদের গৌরবময় শাসন অব্যাহত থাকে।শিল্পকলাচর্চার ক্ষেত্রেও অগ্রগতি সাধিত হয়।বৈদেশিক আক্রমণে চন্দ্রবংশের শক্তিক্ষয় ঘটে এবং রাজ্যটির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার প্রথম রাজবংশ কোনটি?
(ক) খড়্গ (খ) দেব
(গ) চন্দ্র (ঘ) ভদ্র।

২। কে দেব বংশের রাজা নন?
(ক) সমাচারদেব (খ) শান্তিদেব
(গ) আনন্দদেব (ঘ) ভবদেব।

৩। রোহিতাগিরি কোথায় অবস্থিত?
(ক) বিহারের রোহতাসগড়ে (খ) কুমিল্লার লালমাই অঞ্চলে
(গ) রাঙ্গামাটিতে (ঘ) রাজবাড়ী ডাঙ্গায়।

৪। শ্রীচন্দ্র রাজত্ব করেন আনুমানিক–
(ক) ৪০ বছর (খ) ৩৫ বছর
(গ) ৪৫ বছর (ঘ) ৫০ বছর।

৫। শ্রীচন্দ্রের রাজধানী কোথায়অবস্থিত?
(ক) বিক্রমপুরে (খ) দেবপর্বতে
(গ) কোটালীপাড়ায় (ঘ) চন্দ্রদ্বীপে।

৬। কোন নৃপতিকে 'কলানিলয়' বলা হয়েছে?
(ক) লড়হচন্দ্রকে (খ) গোবিন্দচন্দ্রকে
(গ) কল্যাণচন্দ্রকে (ঘ) শ্রীচন্দ্রকে।

৭। বাঙ্গালদেশের রাজা গোবিন্দচন্দ্রের উল্লেখ পাওয়া যায় কোন লিপিতে?
(ক) কৈলান লিপিতে (খ) তিরুমুলাই লিপিতে
(গ) পশ্চিমভাগ লিপিতে (ঘ) ময়নামতি লিপিতে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। ত্রৈলোক্যচন্দ্র সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।
২। হরিকেল রাজ্য সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। দেব রাজবংশের ইতিহাস পুনর্গঠনের উৎসসমূহ কি? দেবরাজাদের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন।
২। চন্দ্রদের আদি বাসভূমি কোথায়? ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে চন্দ্রবংশের প্রথম স্বাধীন নৃপতি বলা যায় কি?
৩। চন্দ্রবংশের ইতিহাস জানার উপাদানগুলো উল্লেখ করুন।শ্রীচন্দ্রের সাম্রাজ্যসীমা চিহ্নিত করুন।
৪। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি হিসেবে শ্রীচন্দ্রের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। Abdul Momin Chowdhury, *Dynastic History of Bengal.*
২। R.C. Majumdar, *History of Ancient Bengal.*
৩। রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১ম খন্ড।
৪। আবদুল মমিন চৌধুরী ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস।*

পাঠ - ৬

বাংলায় সেন শাসন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- সেন বংশের আদি পরিচয় জানতে পারবেন ;
- বিজয়সেনের কৃতিত্বের মূল্যায়ন করতে পারবেন ;
- বল্লালসেনের শাসনকাল সম্পর্কে অবহিত হবেন ;
- লক্ষণসেনের আমলেসেনদের পতনের ইতিহাস জানবেন।

একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় 'সেন বংশ' নামক এক নতুন রাজবংশের উদ্ভব ঘটে। উত্তর বাংলায় সামন্তচক্রের বিদ্রোহের সময় পাল সাম্রাজ্যে দুর্বলতার সুযোগে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয়সেন ধীরে ধীরে নিজ ক্ষমতা প্রসারিত করেন।পাল সম্রাট মদনপালের রাজত্বকালে সেন রাজবংশ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়। পশ্চিম ও উত্তর বাংলা হতে পাল শাসন এবং দক্ষিণ পূর্ব বাংলা হতে বর্ম শাসনের অবসান ঘটিয়ে সেনরা প্রায় সমগ্র বাংলায় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে। তাঁদের শাসনাধীনেই সর্বপ্রথম সমগ্র বাংলায় একক স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সেদিক দিয়ে বাংলার ইতিহাসে সেন শাসনের গুরুত্ব রয়েছে।

সেন বংশের আদি পরিচয়

সেন রাজাদের পূর্বপুরুষ দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কর্ণাট দেশের (মহারাষ্ট্র ও হায়দ্রাবাদ অঞ্চলের দক্ষিণ ও মহীশূর রাজ্যের উত্তর ও পশ্চিম ভাগ) অধিবাসী ছিলেন। সেন রাজাদের লিপি হতে জানা যায়, তাঁরা চন্দ্রবংশীয় ও ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় ছিলেন। সেনরা কোন সময়ে এবং কিভাবে বাংলায় আগমন করেন সে বিষয়ে সঠিক কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব না হলেও সেন লিপিমালার ভিত্তিতে কিছুটা ধারণা করা যায়। সেনদের আগমন কাল সম্বন্ধে বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপি থেকে জানা যায় যে, সামন্ত সেন রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত যুদ্ধাভিযান করে এবং দুর্বৃত্ত কর্ণাটলক্ষ্মী লুণ্ঠনকারী শত্রুদেরকে ধ্বংস করে শেষ বয়সে গঙ্গাতটে পূণ্যাশ্রমে জীবনযাপন করেছিলেন।এ থেকে অনুমিত হয় যে, সামন্তসেনই প্রথমে কর্ণাটে বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন এবং শেষজীবনে বাংলায় এসে গঙ্গাতীরে বাস করেন। বল্লালসেনের নৈহাটি তাম্রশাসনে বলা হয়েছে চন্দ্রবংশজাত অনেক রাজপুত্র রাঢ়দেশের অলংকার স্বরূপ ছিলেন এবং তাদের বংশে সামন্তসেনের জন্ম হয় এবং সামন্তসেনের পূর্বেই কোন এক পূর্বপুরুষ রাঢ়দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। দেওপাড়া লিপি ও নৈহাটি তাম্রশাসনের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করে বলা যায় যে, কর্ণাটের এক সেন বংশ বহুদিন ধরে রাঢ় অঞ্চলে বাস করেছিল। এই বংশের সামন্তসেন কর্ণাটে বীরত্ব প্রদর্শন করে শেষ বয়সে রাঢ়ে এসে জীবনযাপন করেন। পরবর্তীতে তাঁরই বংশধর বাংলায় রাজক্ষমতা অধিকার করেন।

সেন বংশ কিভাবে সুদূর কর্ণাট হতে এসে বাংলায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, তার সঠিক জবাব সেন লিপিমালায় পাওয়া যায় না। তবে এ বিষয়ে আনুমানিক সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করা যায়। সেন বংশ সুদূর কর্ণাট হতে এসে বিজয়ের মাধ্যমে বাংলায় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে মনে হয় না। বরং এমন মনে করাই স্বাভাবিক যে, কর্ণাট দেশীয় সেনবংশ কোন এক সময়ে সম্ভবত সামন্তসেনের সময় বাংলায় এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন

এবং ধীরে ধীরে ক্ষমতা অর্জন করে প্রথমে সামন্তরাজা ও পরে সার্বভৌম স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই প্রেক্ষাপটে সেনবংশের আগমন সম্বন্ধে দুটি গ্রহণযোগ্য সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা যায়। প্রথমত, পাল রাজাদের সৈন্যদলে বিভিন্ন অঞ্চলের লোক ছিল। পাল তাম্রশাসনে প্রাপ্ত কর্মচারী তালিকায় নিয়মিতভাবে 'গৌড়-মালব-খশ-হুন-কুলিক-কর্ণাট-লাট-চাট-ভাট' পদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ থেকে মনে হয় যে, কর্ণাটবাসীও পাল সৈন্যদলে ছিল। সৈন্যদলেরই একজন সেনবংশীয় কর্মচারী শক্তি সঞ্চয় করে পশ্চিম বাংলায় এক রাজ্যাধিপতি হন এবং পরবর্তীতে পাল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে স্বীয় আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হন। দ্বিতীয় সম্ভাবনা হলো, কর্ণাটের চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য ১০৪২ ও ১০৭৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে একাধিকবার উত্তর-পূর্ব ভারত ও বাংলা আক্রমণ করেন। এ সময় সেন রাজবংশের পূর্বপুরুষ কোন আক্রমণকারী সৈন্যদলের সাথে দাক্ষিণাত্য হতে বাংলায় এসে বসতি স্থাপন করেন। পরে এদেরই কেউ স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বল্লালসেনের সাথে চালুক্য রাজকন্যা রামদেবীর বিবাহ সেনবংশের সাথে চালুক্যদের সম্পর্কের প্রমাণ বহন করে। এখানে উল্লেখিত দুটি সম্ভাবনাই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। যদিও সেন লিপিতে এ বিষয়ে কোন আভাস না থাকায় কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব নয়।

সামন্তসেনের পূর্বে সেনবংশের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। সামন্তসেনই এই বংশের প্রথম ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। তাঁর কর্ণাটদেশে যুদ্ধে যশোলাভ এবং বৃদ্ধ বয়সে গঙ্গাতীরে বাস ব্যতিত আর বিশেষ কিছু জানা যায় না।

সামন্তসেনের পুত্র হেমন্তসেন। হেমন্তসেনকে বিজয়সেনের লিপিতে 'মহারাজাধিরাজ' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই উপাধি হতে ধারণা করা হয়, হেমন্তসেনই সেনবংশের প্রথম রাজা। তবে তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন বলে মনে হয় না। কারণ বিজয়সেনের ব্যারাকপুর তাম্রলিপিতে তাঁকে 'রাজরক্ষা সুদক্ষ' বলে উল্লেখ করা হয়। এ থেকে মনে হয় তিনি পাল সাম্রাজ্যের রাঢ় অঞ্চলে সামন্তরাজা ছিলেন এবং অধিরাজের সাম্রাজ্য রক্ষায় দক্ষতা প্রদর্শন করেন।

বিজয় সেন

হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়সেন সামন্তরাজা হতে নিজেকে স্বাধীন রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং স্ববংশীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় সফল হন।বিজয়সেনের একটি তাম্রশাসন ও একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। তাম্রশাসনটি তাঁর ৬২ রাজ্যাঙ্কে লিখিত বলে সাধারণভাবে গৃহীত। সে অনুযায়ী বিজয়সেনের রাজত্বকাল ধরা হয় ১০৯৮ হতে ১১৬০ খ্রিঃ পর্যন্ত।

পালরাজা রামপালের রাজত্বকালে বিজয়সেন খুব সম্ভবত রাঢ় অঞ্চলে প্রথমে সামন্ত রাজা হয়েছিলেন। পরে ক্ষুদ্র ভূ-খন্ডের অধিপতি হন।যে সকল সামন্তরাজা রামপালকে বরেন্দ্র উদ্ধারে সাহায্য করেছিলেন নিদ্রাবলীর বিজয়রাজ ছিলেন তাঁদেরই একজন। এই বিজয়রাজই সেনরাজা বিজয়সেন, সে ধরনের ইঙ্গিত রয়েছে কবি উমাপতি বিরচিত দেওপাড়া প্রশস্তির ঊনবিংশ শ্লোকে। সেখানে বলা হয়েছে, বিজয়সেন দিব্যভূমি বিপক্ষ দলীয় নরপতিকে দান করেছিলেন এবং প্রতিদানস্বরূপ বিপুল অধিকার লাভ করেছিলেন। শ্লোকে ব্যবহৃত 'দিব্যভূব' দিব্য কর্তৃক শাসিত ভূমি অর্থাৎ বরেন্দ্রকে বোঝাতে পারে।এরূপ অর্থে শ্লোকের ব্যাখ্যা দাঁড়ায় যে, বরেন্দ্র উদ্ধারে বিজয়সেন পাল রাজাকে সাহায্য করেছিলেন এবং প্রতিদানে তিনি রাঢ়ে স্বাধীন ক্ষমতা লাভ করেছিলেন।শ্লোকে পাল রাজাকে বিপক্ষ দলীয় বলার কারণ হয়তো এই যে, পরবর্তীকালে তাঁদেরকে পরাস্ত করে বিজয়সেন গৌড় ও উত্তরবঙ্গ অধিকার করেছিলেন।দেওপাড়া শিলালিপিতে গৌড়ের বিরুদ্ধে বিজয়সেনের সাফল্যের কথা উল্লেখ আছে। বরেন্দ্র উদ্ধারে রামপালকে সাহায্য করার পরিবর্তে বিজয়সেন স্বীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি পেয়েছিলেন এমন মনে করাও অযৌক্তিক নয়। কারণ রামচরিতে উল্লেখ আছে যে, রামপাল বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি ও উপঢৌকনের বিনিময়ে সামন্তদের সাহায্য লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। সুতরাং দেওপাড়া প্রশস্তির শ্লোকের ওপর ভিত্তি করে বিজয়সেনের ক্ষমতা সম্প্রসারণের প্রথম পর্যায় সম্বন্ধে অনুমান করা যায় যে, তিনি রাঢ়ের সামন্তরাজা ছিলেন, রামপালকে বরেন্দ্র উদ্ধারে সাহায্যের বিনিময়ে তিনি স্বীয়

স্বাধীনতার স্বীকৃতি পান এবং পরবর্তীতে ক্ষমতা সম্প্রসারণ করে সমগ্র বাংলায় স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

বিজয়সেন কর্তৃক স্বীয় ক্ষমতার ক্রমোন্নতির কোন ধারাবাহিক বিবরণ নেই। মনে হয় শূরবংশীয় রাজকন্যা বিলাসদেবীর সাথে বিয়ে তাঁর ক্ষমতা সম্প্রসারণে সাহায্য করেছিল। এই বিয়ের কথা তাঁর ব্যারাকপুর তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে। বিজয়সেন উড়িষ্যারাজ অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গেরও সাহায্য লাভ করে থাকতে পারেন। বল্লাল চরিত গ্রন্থে বিজয়সেনকে 'চোড়গঙ্গসখা' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

কবি উমাপতিধর রচিত দেওপাড়া শিলিলিপিতে বিজয়সেনের ক্ষমতা সম্প্রসারণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, নান্য, বীর, রাঘব ও বর্ধন নামক রাজাগণ তাঁর সাথে যুদ্ধে পরাজিত হন।তিনি কামরূপরাজকে দূরীভূত, কলিঙ্গরাজকে পরাজিত ও গৌড়রাজকে দ্রুত পলায়নে বাধ্য করেন এবং গঙ্গার স্রোত ধরে এক 'পাশ্চাত্যচক্রের' বিরুদ্ধে নৌ-অভিযান প্রেরণ করেন।কিন্তু উমাপতিধর ধারাবাহিকতা বজায় না রাখায় বিভিন্ন দিকে বিজয়সেনের অভিযান কোনটির পর কোনটি সংঘটিত হয়েছিল তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে সম্ভাব্য ঘটনাক্রম সম্বন্ধে অনুমান করা যায়।

খুব সম্ভবত নিড়োলে সামন্তরাজা হিসেবে বিজয়সেনের উত্থান শুরু। উত্তর বাংলায় সামন্তবিদ্রোহের সুযোগে তিনি নিজশক্তি বৃদ্ধি করেন। কৈর্বতদের বিরুদ্ধে রামপালের সাফল্য কিছুদিনের জন্য তাঁর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার অভিযান স্থগিত রাখতে বাধ্য করে এবং তিনি সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। ইতোমধ্যে শূর পরিবারে তাঁর বিয়ে রাঢ় অঞ্চলে তাঁর ক্ষমতা দৃঢ় করতে সাহায্য করে। রামপালের দুই দুর্বল উত্তরাধিকারীর রাজত্বকালে অন্যান্য সামন্তরাজাদের ক্ষমতা খর্ব করে নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন। বীর (কোটাটবীর রাজ বীরগুণ) ও বর্ধন (কৌশাম্বীর রাজা দ্বোরপবর্ধন কিংবা মদনপাল কর্তৃক পরাজিত গোবর্ধন) প্রমুখের বিরুদ্ধে বিজয়সেনের সাফল্য এই পর্যায়ের।

রাঘব ও কলিঙ্গরাজ সম্ভবত একই ব্যক্তি। রাঘব ছিলেন উড়িষ্যারাজ চোড়গঙ্গের পুত্র। তিনি ১১৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। সুতরাং বিজয়সেনের রাজত্বের শেষদিকে রাঘবের সাথে তাঁর সংঘর্ষ হতে পারে। বিজয়সেন কর্তৃক বাংলায় ক্ষমতা বিস্তারের পর পার্শ্ববর্তী রাজ্য উড়িষ্যার বিরুদ্ধে অভিযান খুবই স্বাভাবিক।

মিথিলার রাজা নান্যদেবের বিরুদ্ধে বিজয়সেনের যুদ্ধ ১১৪৭ খ্রিস্টাব্দের আগেই সংঘটিত হয়েছিল। কারণ, ১১৪৭ খ্রিঃ ছিল নান্যদেবের রাজত্বের শেষ বছর। সুতরাং মনে করা হয়, নান্যদেব ১০৯৭ খ্রিঃ উত্তর বিহারে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে হয়তো বাংলা অভিমুখে যাত্রা করেন এবং বিজয়সেনের সাথে তাঁর সংঘর্ষ বাঁধে। প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে সাফল্য তাঁর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করে।

দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিকালে বিজয়সেন প্রতাপশালী হয়ে ওঠেন। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বর্মরাজ বংশের ক্ষমতার অবসান ঘটিয়ে তিনি সেখানে সেন প্রভুত্ব বিস্তার করেন। সম্ভবত একই সময়ে উত্তর বাংলা হতে পাল শাসনেরও অবসান ঘটে এবং সমগ্র বাংলায় সেন শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজয়সেন যে গৌড়রাজকে দ্রুত পালাতে বাধ্য করেন তিনি যে পালরাজা মদনপাল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। মদনপালের অষ্টম রাজ্যাঙ্ক পর্যন্ত অর্থাৎ ১১৫২-৫৩ খ্রিঃ পর্যন্ত উত্তর বাংলায় পাল আধিপত্যের প্রমাণ মনহলি তাম্রশাসন হতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই সময়ের পরেই বিজয়সেন পাল সাম্রাজ্যের ওপর আঘাত হানেন এবং স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার করেন। রাজশাহীর সাত মাইল পশ্চিমে দেওপাড়া নামক স্থানে বিজয়সেনের প্রাপ্ত লিপি হতে জানা যায় তিনি ঐ স্থানে প্রদ্যুম্নেশ্বর শিবের এক বিরাট মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। সুতরাং এই লিপি প্রমাণ করে যে, বরেন্দ্রে বিজয়সেনের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।রামচরিত গ্রন্থে মদনপাল কর্তৃক আক্রমণকারী সৈন্যদলকে কালিন্দী পর্যন্ত হটিয়ে দেবার যে উল্লেখ আছে তাতে সম্ভবত বিজয়সেনের আক্রমণের কথাই বলা হয়েছে। মদনপাল প্রাথমিক পর্যায়ে সাফল্য অর্জন করলেও মদনপালের অষ্টম রাজ্যাঙ্কের পর উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পাল লিপির অনুপস্থিতি বিজয়সেন কর্তৃক এই অঞ্চলে প্রভুত্ব বিস্তারের কথাই প্রমাণ করে।

পাল শক্তির বিরুদ্ধে সাফল্যের পর বিজয়সেন গঙ্গাস্রোত ধরে কোন এক পাশ্চাত্য শক্তির বিরুদ্ধে বিজয়াভিযান প্রেরণ করা খুব অস্বাভাবিক নয়।সম্ভবত গাহড়বাল রাজই এই পাশ্চাত্য শক্তি। কারণ সে সময় গাহড়বাল শক্তিই বিহার পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। তবে এই নৌ-অভিযানে বিজয়সেনের সাফল্য সম্বন্ধে কোন ধারণা পাওয়া যায় না।

বিক্রমপুর হতে প্রকাশিত বিজয়সেনের ব্যারাকপুর তাম্রশাসন হতে প্রমাণিত হয় যে, চন্দ্র ও বর্ম রাজবংশের রাজধানী বিক্রমপুর সেন রাজ্যের রাজধানী হয়েছিল। একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হতে দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বর্মরাজাদের শাসন বজায় ছিল।বিজয়সেন বর্মরাজাদের শাসনের অবসান ঘটিয়ে এই অঞ্চলে সেন প্রভূত্ব বিস্তার করেন।

বিজয়সেন কর্তৃক উল্লেখিত অভিযানসমূহ সেন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পর ক্ষমতা সম্প্রসারণের চেষ্টারই অভিব্যক্তি।তাঁর সাফল্যের বিবরণ হতে দেখা যায়, বহুযুদ্ধে তিনি জয়লাভ করে প্রায় সমগ্র বাংলায় এক অখন্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

বিজয়সেন কর্তৃক পাল সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিয়ে সমগ্র বাংলায় স্ব-বংশীয় শাসন প্রতিষ্ঠা বাংলার ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।সেন বংশের অধীনেই সর্বপ্রথম বাংলা দীর্ঘকালব্যাপী একাধিপত্যে ছিল। এই আধিপত্যের ফল বাংলার জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়, সে কারণেই সেন যুগের এত গুরুত্ব। বিজয়সেন পরম মহেশ্বর, পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন এবং "অরিরাজ বৃষভ শঙ্কর' গৌরবসূচক নামেও পরিচিত ছিলেন। দেওপাড়া প্রশস্তিতে বিজয়সেন কর্তৃক অনুষ্ঠিত যাগযজ্ঞের উল্লেখ রয়েছে। এসব যাগযজ্ঞ হতে অনুমান করা হয়, বৈদিক ধর্মের প্রতি তিনি বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁর অনুগ্রহে ব্রাহ্মণগণ বিত্তশালী ও ধনবান হয়ে উঠেছিল। তাই বিজয়সেন কর্তৃক উদ্বুদ্ধ হয়ে কবি শ্রী হর্ষ তাঁর বিজয় প্রশস্তি ও গৌড়বীর্শকূল-প্রশস্তি রচনা করেছিলেন, এরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।সুতরাং একদিকে বিজয়সেন যেমন সমরাঙ্গনে সাফল্য অর্জন করে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তেমনি অন্যদিকে ধর্মকর্মের দিকেও তিনি যত্নবান ছিলেন। তাই বাংলায় সেন রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিজয়সেন স্মরণীয় হয়ে আছেন।

বল্লালসেন

বিজয়সেনের পর তাঁর পুত্র বল্লালসেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। নৈহাটিতে প্রাপ্ত একটি তাম্রশাসন, ভাগলপুর জেলার কহলগ্রাম হতে ১১ মাইল দূরে সনোখার গ্রামে প্রাপ্ত একটি মূর্তিলিপি, বল্লালসেন রচিত 'দানসাগর' ও 'অদ্ভূতসাগর' নামক দুটি গ্রন্থ এবং আনন্দভট্ট রচিত 'বল্লালচরিত' গ্রন্থ হতে বল্লালসেনের রাজত্বকালের ইতিহাস জানা যায়। বল্লালচরিত সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য না হলেও এর মধ্যে সমসাময়িককালের বিশেষ করে সামাজিক ইতিহাসের কিছু তথ্য অন্তর্নিহিত আছে। তথাপি পরবর্তীকালে সংকলিত যে কোন গ্রন্থের মতই বল্লালচরিতের তথ্যকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে গ্রহণ করা হয়।

নৈহাটি তাম্রশাসনে বল্লালসেনের কৃতিত্ব সম্বন্ধে তেমন কোন বিবরণ নেই। তবে সনোখারে প্রাপ্ত মূর্তিলিপি বল্লালসেন কর্তৃক পূর্ব মগধ অঞ্চল জয়ের কথা ঘোষণা করে। মদনপালের পর গোবিন্দপাল মগধের রাজা হন। সম্ভবত তাঁকে পরাজিত করে বল্লালসেন পূর্বাঞ্চল (ভাগলপুর জেলা) অধিকার করেন। গৌড়ের ওপর গোবিন্দপালের কোন অধিকার না থাকলেও তিনি "গৌড়েশ্বর" উপাধি ধারণ করতেন। "অদ্ভূতসাগর" গ্রন্থে গৌড়রাজ্যের সাথে বল্লালসেনের যে যুদ্ধের উল্লেখ আছে তা নিঃসন্দেহে গোবিন্দপালের বিরুদ্ধে মগধের পূর্বাঞ্চল অধিকারের যুদ্ধ। এই গ্রন্থে আরো বলা হয়, পিতার জীবদ্দশায় বল্লালসেন মিথিলা জয় করেন। তবে মিথিলা সেন সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। নান্যদেবের উত্তরাধিকারীগণ মিথিলায় রাজত্ব করেন এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। কয়েক শতাব্দীকাল পরে সংকলিত জনপ্রবাদ আছে, মিথিলা বল্লালসেনের রাজ্যের পাঁচটি প্রদেশের একটি ছিল, এটি সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাছাড়া উত্তর বিহারে প্রচলিত 'লক্ষণ-সম্বৎ' এর সাথে বাংলার সেনবংশের কোন সম্বন্ধ ছিল কিনা তা আজও প্রমাণের

অপেক্ষায় আছে। কারণ 'লক্ষণ সম্বৎ' যদি সেনরাজা লক্ষণসেনের নামের সাথে জড়িত হয়ে থাকে তাহলে বাংলার কোন জায়গায় কিংবা সেনরাজাদের বিশেষ করে লক্ষণসেন ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের সরকারি দলিলে এই 'সম্বৎ' এর ব্যবহার থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সেন দলিলে সবক্ষেত্রেই রাজ্যাঙ্কের প্রচলন। সুতরাং 'লক্ষণ-সম্বৎ' এর প্রচলনের ভিত্তিতে বলা যায় না যে মিথিলা সেন রাজ্যভুক্ত হয়েছিল।

বল্লালসেনকে প্রচলিত কুলীন প্রথার প্রবর্তক মনে করা হয়।তবে ইদানিংকালের গবেষণার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হয় যে, কুলীন প্রথার সাথে বল্লালসেনের সম্পর্কের কোন যুক্তিযুক্ত ভিত্তি নেই। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় কুলীন প্রথার বহুল প্রচলন দেখা দেয়। এই প্রথার উদ্যোক্তা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় নিজেদের দাবীকে জোরদার করতে একে ঐতিহাসিক ভিত্তি দেয়ার চেষ্টা করেন।ফলে বিগত হিন্দু শাসনকালে অর্থাৎ সেনযুগে কুলীন প্রথার উৎপত্তি হয়েছিল, এ ধরনের মতবাদ প্রচার করেন। যদি এই প্রথা সেনযুগে প্রবর্তিত হতো তাহলে সে যুগের সাহিত্য ও লিপিমালায় এর উল্লেখ থাকা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ভবদেব ভট্ট, হলায়ূধ মিশ্র, অনিরুদ্ধ প্রমুখ সেনযুগের পন্ডিতগণ বহু বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করলেও কুলীন প্রথা সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ রচনা করেননি। এমনকি এ বিষয়ে কোন উক্তিও তাঁদের লেখনিতে নেই। সুতরাং কুলীন প্রথার সাথে বল্লালসেনকে সম্পর্কিত করার কোন ভিত্তি নেই বললেই চলে। বাংলার সামাজিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এ ধরনের একটি কল্পিত উপকথার প্রচার করেছে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়।

বল্লালসেন বিদ্বান পন্ডিত হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রশস্তিকার তাঁকে 'বিদ্বানমন্ডলীর চক্রবর্তী' বলে উল্লেখ করেন। বল্লালসেন কর্তৃক রচিত দুটি গ্রন্থ প্রশস্তিকারের এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করে। ১১৬৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি দানসাগর রচনা সমাপ্ত করেন। এবং ১১৬৯ খ্রিস্টাব্দে অদ্ভূতসাগর গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। কিন্তু সেই গ্রন্থ সমাপ্ত করেন তাঁর পুত্র লক্ষণসেন। দানসাগরের উপসংহার হতে জানা যায়, গুরু অনিরুদ্ধের কাছে বল্লালসেন বেদস্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন।

বল্লালসেন শৈব ছিলেন। তিনি অন্যান্য উপাধির পাশাপাশি "অরিরাজ নিঃশঙ্ক শঙ্কর" উপাধি গ্রহণ করেন। অদ্ভূতসাগরের একটি শ্লোকে বল্লালসেনের মৃত্যুর বিবরণ রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, বৃদ্ধ বয়সে পুত্র লক্ষনসেনের হাতে রাজ্যভার হস্তান্তর করে বল্লালসেন সস্ত্রীক ত্রিবেণীর কাছে গঙ্গাতীরে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করে শেষ জীবন কাটান।

বল্লালসেন তাঁর ১৮ বছর (আনু: ১১৬০-১১৭৮ খ্রি:) রাজত্বকালে পিতৃরাজ্য অক্ষুন্ন রাখেন এবং সেনরাজ্য মগধে সম্প্রসারিত করেন। তবে জ্ঞানী ও পন্ডিত হিসেবেই তাঁর খ্যাতি অধিক। এই খ্যাতি বাংলায় তাঁর নাম চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

লক্ষণসেন

বল্লালসেনের পর তাঁর পুত্র লক্ষণসেন পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। লক্ষণসেনের রাজত্বে প্রকাশিত ৮টি তাম্রশাসন, তার সভাকবিগণ কর্তৃক রচিত কয়েকটি স্তুতিবাচক শ্লোক, তাঁর পুত্রদ্বয়ের তাম্রশাসন ও ঐতিহাসিক মিনহাজুদ্দিন বিরচিত "তাবাকাৎ-ই-নাসিরি" নামক গ্রন্থ হতে তাঁর রাজত্বকাল সম্পর্কে জানা যায়।

মাধাইনগর তাম্রশাসন ও ভাওয়াল তাম্রশাসন ব্যতিত অন্য তাম্রশাসনগুলো তাঁর রাজত্বের ৬ষ্ঠ বছরের মধ্যে উৎকীর্ণ। এগুলোতে লক্ষণসেন সম্বন্ধে সাধারণভাবে প্রশংসাসূচক শ্লোক রয়েছে। তাঁর কৃতিত্ব সম্পর্কে সঠিক বর্ণনা নেই। তবে মাধাইনগর ও ভাওয়াল তাম্রশাসনে তাঁর কৃতিত্বের অতি স্তুতিবাচক বর্ণনা পাওয়া যায়। এখানে বলা হয়েছে, তিনি কৌমারে উদ্ধত গৌড়েশ্বরের শ্রীহরণ ও যৌবনে কলিঙ্গদেশ অভিযান করেন। তিনি যুদ্ধে কাশীরাজকে পরাজিত করেন এবং ভীরু প্রাগজ্যোতিষের (কামরূপ ও আসাম) রাজা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। মাধাইনগর তাম্রশাসনে লক্ষণসেনকে অতি উচ্চ সম্মানসূচক উপাধি 'বীর চক্রবর্তী সার্বভৌম বিজয়ী' দেয়া হয়েছে। তাঁর পুত্রদের তাম্রশাসনে প্রশংসা করে বলা হয়েছে তিনি পুরী, বারাণসী ও প্রয়াগে

"সমরস্তম্ভ" স্থাপন করেন। এসব শ্লোকের ওপর বিশ্বাস করলে মনে হয় লক্ষণসেন বিজয়াভিযানকালে গৌড়, কলিঙ্গ,কামরূপ ও কাশীর রাজাদের পরাজিত করেছিলেন। তবে মাধাইনগর ও ভাওয়াল তাম্রশাসনে ব্যবহৃত 'কৌমারকেলী' পদটি তাৎপর্যপূর্ণ।সুতরাং যেসব বিজয়াভিযানের উল্লেখ রয়েছে সেগুলো লক্ষণসেনের যৌবনে ঘটেছিল মনে করাই সঙ্গত। সম্ভবত তাঁর পিতামহের রাজত্বকালে যেসব বিজয়াভিযান সংঘটিত হয়েছিল, লক্ষণসেন সেসব অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মিনহাজের বর্ণনা হতে জানা যায়, বখতিয়ার খলজীর আক্রমণকালে লক্ষণসেন আশি বছরের বৃদ্ধ ছিলেন। সুতরাং পিতামহের রাজত্বকালে তাঁর যৌবনকালই চলছিল।

ভাওয়াল তাম্রশাসন লক্ষণসেনের রাজত্বের ২৭ রাজ্যাঙ্কে (সম্ভবত মুসলিম আক্রমণের পর) উৎকীর্ণ হয়েছিল। মাধাইনগর তাম্রশাসনও কাছাকাছি সময়ে উৎকীর্ণ বলে মনে হয়। কারণ এই তাম্রশাসনে 'ঐন্দ্রিমহাশক্তি যজ্ঞে'র উল্লেখ আছে। এই যজ্ঞ কোন আগত বিপদ হতে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যেই করা হয়। মুসলমান আক্রমণই হয়তো এই আগত বিপদ। সুতরাং ভাওয়াল ও মাধাইনগর তাম্রশাসন দুটি লক্ষণসেনের রাজত্বের শেষ দিকের এবং এ সময় সেনরাজ্য হয় মুসলমান আক্রমণের অপেক্ষা করছিল নাহয় আক্রমনের ফলে সাম্রাজ্যের কিছু অংশ ইতোমধ্যেই হারিয়েছিলেন। এমন এক বিপদের সময় বিগত গৌরব ও কৃতিত্বের কথা উচ্চারণ করার প্রয়োজনের তাগিদেই প্রশস্তিকার লক্ষণসেনের যৌবনকালের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, তাঁর রাজত্বের প্রথমদিকের তাম্রশাসনে এসব কৃতিত্বের উল্লেখ একেবারেই অনুপস্থিত। কিন্তু পুত্রদ্বয়ের তাম্রশাসনে এসব কৃতিত্বকে আরো গৌরবময় করতে লক্ষণসেন কর্তৃক বিভিন্নভাবে 'সমরজয় স্তম্ভ' স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া সমসাময়িক গাহড়বালরাজ জয়চন্দ্রের (১১৭৩-১২১৯ খ্রিঃ) রাজত্বকালে উত্তর বিহার ও মগধের পশ্চিমাংশ তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। কাশী ও প্রয়াগও তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। সুতরাং তাঁকে পরাজিত করে কাশী ও প্রয়াগে লক্ষণসেন জয়স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন বলে মনে হয় না।

ভাওয়াল ও মাধাইনগর তাম্রশাসনে লক্ষণসেন 'গৌড়েশ্বর' উপাধি গ্রহণ করেন।কিন্তু বিজয়সেন ও বল্লালসেন এই উপাধি ব্যবহার করেননি।এমনকি লক্ষণসেনের রাজত্বের প্রথম দিকে উৎকীর্ণ তাম্রশাসনসমূহেও এই উপাধির ব্যবহার দেখা যায় না। সুতরাং বিজয়সেন ও বল্লালসেনের তাম্রশাসনে 'গৌড়েশ্বর' উপাধির অনুপস্থিতি এবং লক্ষণসেনের তাম্রশাসনে এই উপাধির প্রথম ব্যবহার হতে অনেক অনুমান করেন যে, গৌড় লক্ষণসেনের শাসনকালেই পুরোপুরিভাবে সেন সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। অর্থাৎ গৌড় বিজয় অসমাপ্ত ছিল এবং লক্ষণসেন এই বিজয় সম্পন্ন করে 'গৌড়েশ্বর' উপাধি ধারণ করেন। তবে এই অনুমান তেমন যুক্তিসঙ্গত নয়। মদনপালের পর বাংলার কোন অংশে পাল শাসনের কোন নিদর্শন আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তাছাড়া গৌড় অঞ্চলে লক্ষণসেনের প্রভুত্ব তাঁর রাজত্বকালের প্রথম বছর হতেই ছিল বলে প্রমাণ আছে। তাঁর দ্বিতীয় রাজ্যাঙ্কে গোবিন্দপুর তাম্রশাসনের মাধ্যমে তাঁর অভিষেক উপলক্ষে গৌড় অঞ্চলে ভূমিদান করা হয়। তাঁর ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্কে শক্তিপুর তাম্রশাসনের মাধ্যমেও গৌড় অঞ্চলে ভূমিদান করা হয়। সুতরাং লক্ষণসেন কর্তৃক গৌড় বিজয় সম্পন্ন করার পক্ষে কোন যুক্তি নেই।'গৌড়েশ্বর' উপাধি গ্রহণের তাৎপর্য অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। কেবলমাত্র দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় রাজত্বরত বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন কর্তৃক 'গৌড়েশ্বর' উপাধি গ্রহণ বা তাঁদের তাম্রশাসনে সকল সেন রাজার প্রতি এই উপাধির ব্যবহার একথাই প্রমাণ করে যে, মুসলিম আক্রমণের ফলে গৌড় অঞ্চল হাতছাড়া হওয়ার পর পূর্ব গৌরব বজায় রাখা ও তা ঘোষণা করার প্রয়োজনে এই উপাধি ব্যবহার করা হয়েছে। মগধের অংশবিশেষের পাল রাজা গোবিন্দপাল ও পলপাল কর্তৃক 'গৌড়েশ্বর' উপাধি গ্রহণ এই প্রবণতারই ফল।

লক্ষণসেন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর সমরক্ষেত্রে কোন সাফল্য অর্জন করেছিলেন কিনা তা স্পষ্ট জানা যায় না। 'প্রবন্ধকোষ' ও 'পুরাতন প্রবন্ধ সংগ্রহ' নামক জৈন গ্রন্থদুটি হতে অনুমান করা হয়, লক্ষণসেন তাঁর মন্ত্রী কুমারদেবের বুদ্ধি ও কৌশলের দরুন গাহাড়বাল রাজাদের আক্রমণকে প্রতিহত করেছিলেন।

লক্ষণসেনের দুই সভাকবি উমাপতিধর ও শরণ রচিত কয়েকটি শ্লোকে এক নামহীন রাজার বিজয় কাহিনী বর্ণিত আছে। সেখানে বলা হয়েছে, সেই রাজা প্রাগ্‌জ্যোতিষ, গৌড়, কলিঙ্গ, কাশী, মগধ প্রভৃতি অঞ্চল জয়

করেন এবং চেদি (রতনপুরের কলচুরি বংশ) ও ম্লেচ্ছ রাজকে পরাজিত করেন। চেদি ও ম্লেচ্ছরাজ ব্যতিত অন্যান্য বিজয়গুলো লক্ষণসেন সম্বন্ধে প্রযোজ্য বলে মনে করা হয়। শ্লোকগুলো লক্ষণসেনের উদ্দেশ্যেই রচিত। মধ্যপ্রদেশের একটি লিপিতে আছে যে, চেদিদের সামন্ত বল্লভরাজ গৌড়রাজকে পরাজিত করেন। সুতরাং লক্ষণসেনের সাথে চেদিরাজদের সংঘর্ষ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, যদিও এর ফলাফল সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জানা যায় না। লক্ষণসেনের সভাকবি শরণ লক্ষণসেন কর্তৃক এক ম্লেচ্ছরাজার পরাজয়ের কথা উল্লেখ করেন। নিহাররঞ্জন রায় অনুমান করেন যে, বখতিয়ার কর্তৃক নদীয়া জয়ের পূর্বে বা পরে লক্ষণসেন তাঁর বিরুদ্ধে সাফল্য লাভ করেছিলেন। এবং শরণ এরই উল্লেখ করেন। তবে অনেকে অনুমান করেন, ম্লেচ্ছ বলতে আরাকানের মগ বুঝিয়েছেন, যারা হয়ত বাংলায় আগমন করেছিল এবং লক্ষণসেন তাদের পরাজিত করেছিলেন।

লক্ষণসেনের রাজত্বের শেষদিকে বার্ধ্যক্যের কারণে তিনি দূর্বল হয়ে পড়েন।এ সময় সাম্রাজ্যে অভ্যন্তরীণ বিপ্লবের চিহ্ন লক্ষ করা যায়। সুন্দরবন এলাকায় ১১৯৬ খ্রিস্টাব্দে ডোম্মনপাল নামক এক স্বাধীন রাজার অস্তিত্ব সেন শাসনের দুর্বলতারই পরিচয় বহন করে। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ভারতে মুসলিম শক্তির আবির্ভাব ঘটে এবং ক্রমশ সেন সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমা পর্যন্ত মুসলিম শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

সম্ভবত ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম সেনাপতি বখতিয়ার খলজী নদীয়া আক্রমণ করেন। এ সময় বৃদ্ধ লক্ষণসেন নদীয়ায় অবস্থান করেছিলেন। বখতিয়ার নদীয়া আক্রমণ করলে তিনি প্রতিরোধ না করে নদীপথে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় পালিয়ে যান। ফলে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলায় মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় অবস্থান করে লক্ষণসেন আরো দুই-এক বছর রাজত্ব করেন। অবশেষে আনুমানিক ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

লক্ষণসেনের রাজত্বকালে (১১৭৮-১২০৫ খ্রিঃ) সেন শাসন চরম উন্নতি এবং চরম অবনতি উভয়পথেই ধাবিত হয়।রাজত্বের প্রথম দিকে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি লক্ষণসেন শান্তিকালীন বিভিন্ন কার্যে মনোযোগ দেন। রাজত্বের শেষদিকে উত্তর ও পশ্চিম বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় সীমাবদ্ধ রাজ্যের অধিপতিতে পরিণত হন।

লক্ষণসেন নিজে ছিলেন সুপন্ডিত এবং সুকবি। পিতার অসমাপ্ত গ্রন্থ 'অদ্ভূতসাগর' তিনি সমাপ্ত করেন। এছাড়া তাঁর রচিত কয়েকটি শ্লোক পাওয়া গেছে। লক্ষণসেনের রাজসভা সেই যুগের জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিবর্গ দ্বারা অলংকৃত ছিল। সভায় ধোয়ী, শরণ, জয়দেব, গোবর্ধন, উমাপতিধর প্রমুখ প্রসিদ্ধ কবিগণের সমাবেশ ঘটেছিল। ভারত প্রসিদ্ধ পন্ডিত হলায়ূধ তাঁর প্রধানমন্ত্রী ও ধর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। হলায়ূধ ব্রাহ্মণসর্বস্ব এবং মৎস্যসূক্ত ভিন্ন মীমাংসাসর্বস্ব, বৈষ্ণবসর্বস্ব ও পন্ডিত সর্বস্ব রচনা করেন। হলায়ূধের সমসাময়িক অন্যান্য পন্ডিতদের মধ্যে ছিলেন পুরুষোত্তম, পশুপতি ও ঈশান। কবিদের মধ্যে গোবর্ধন 'আর্যসপ্তশতী', জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' এবং কবীন্দ্র ধোয়ী 'পবনদূত' রচনা করে অমরত্ব লাভ করেন।এ সময়ে সাহিত্যের পাশাপাশি শিল্পক্ষেত্রেও বাংলা উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করেছিল।

লক্ষণসেন পিতা ও পিতামহের শৈবধর্ম ত্যাগ করে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি পিতা ও পিতামহের 'পরম মহেশ্বর' উপাধি ত্যাগ করে 'পরমবৈষ্ণব' উপাধি ধারণ করেন। ঐতিহাসিক মিনহাজ লক্ষণসেনের দানশীলতা ও ঔদার্যের সুখ্যাতি এবং শাসনরীতির প্রশংসা করে তাঁকে হিন্দুস্তানের রায়গণের পুরুষানুক্রমিক খলিফা স্থানীয় বলে বর্ণনা করে। সে যুগের হাতেম কুতুবুদ্দিনের সাথে তুলনা করেন এবং আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেন যেন লক্ষণসেনের পরলোকে শান্তি লাঘব করেন।

সেন শাসনের শেষ পর্যায়

লক্ষণসেনের পর তাঁর দুই পুত্র বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই দুই ভ্রাতার মোট রাজত্বকাল প্রায় ২৫ বছর (আনুমানিক ১২০৫-১২৩০ খ্রিঃ) ছিল বলে অনুমান করা হয়। দুই রাজারই তাম্রশাসন পাওয়া গেছে এবং উভয়েই ছিলেন সূর্যের উপাসক।

বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেনের রাজত্বকালের বিস্তৃত বিবরণ নেই। তাঁদের তাম্রশাসন বিক্রমপুর ও বঙ্গ অঞ্চলে ভূমিদান করেছিল। সুতরাং তাঁদের রাজ্য সীমা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায়ই সীমাবদ্ধ ছিল বলে মনে হয়।নদী বিধৌত এই অঞ্চলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে আরো প্রায় এক শতাব্দী সময় লাগে। তাম্রশাসনে বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন উভয়েই 'যবনাম্বয়-প্রলয়-কালরুদ্র' বলে অভিহিত হন। সুতরাং ধারনা করা হয়, তাঁরা মুসলিম আক্রমণকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এটা কেবল প্রশস্তিকারের স্তুতিবাক্যই নয়, মিনহাজউদ্দিনের ইতিহাস হতেও প্রমাণিত হয় যে, তুর্কিগণ উত্তরবঙ্গ সমগ্র বা অধিকাংশ অধিকার করলেও বহুদিন পর্যন্ত পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ অধিকার করতে পারেন নাই।

বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনে কুমার সূর্যসেন ও পুরুষোত্তমসেনের নাম পাওয়া যায়। এদের কেউ রাজত্ব করেছিলেন কিনা তা জানা যায় না। তবে মিনহাজ যে সময়ে (আনুঃ ১২৪৪-৪৫ খ্রিঃ) লক্ষণাবতীতে এসে বাংলার ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করেন তখনও লক্ষণসেনের বংশধর বঙ্গে রাজত্ব করছিলেন বলে মিনহাজ তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেন। সুতরাং কেশবসেনের পরেও একাধিক সেন রাজা বঙ্গে রাজত্ব করতেন বলে মনে হয়। তবে তাঁদের বিস্তারিত ইতিহাস জানা যায়নি।

বিক্রমপুরে প্রকাশিত আদাবাড়ি তাম্রশাসন হতে 'দশরথদেব' নামক এক রাজার নাম পাওয়া যায়। তিনি পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ অধিরাজ দনুজমাধব উপাধি ধারন করেন। সম্ভবত দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন বাংলা অভিযানের সময় 'রায় দনুজ' নামক যে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার রাজার সাথে সন্ধি করেন তিনিই সেই দশরথদেব।ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কোন সময়ে বিক্রমপুরে সেন শাসনের অবসান ঘটে এবং 'দেব' নামক এক রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।এ অঞ্চলে এটিই শেষ হিন্দু রাজবংশ। কেননা, এরপর (ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে ও চতুর্দশ শতাব্দীর শুরুতে) এ অঞ্চলে মুসলিম আধিপত্য বিস্তার লাভ করে।

সারসংক্ষেপ

সেনদের শাসনাধীনে বাংলা সর্বপ্রথম একক স্বাধীন রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজয়সেন হলেন এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। উমাপতি ধরের দেওপাড়া প্রশস্তির আলোকে বিজয়সেনের গৌরবগাঁথা বিস্তারিত জানা যায়। বিজয়সেনের পর বল্লালসেন ও লক্ষণসেন রাজত্ব করেন। বল্লালসেনকে কুলীন প্রথার প্রবর্তক মনে করা হয়, যদিও এর কোন যুক্তিযুক্ত ভিত্তি নেই। তিনি একজন পন্ডিত হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। লক্ষণসেনের আমলে মুসলিম আক্রমণে সেন শাসনের অবসান ঘটে। ক্রমাগত বৈদেশিক আক্রমণেও সেনদের ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে।বখতিয়ার খলজীর নদীয়া আক্রমণের পর লক্ষণসেন দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় পালিয়ে যান। সুপন্ডিত এবং কবি হিসেবে লক্ষণসেন বিখ্যাত ছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। 'মহারাজাধিরাজ' উপাধিকারী প্রথম সেন শাসকের নাম কী?
(ক) বিজয়সেন (খ) হেমন্তসেন
(গ) সামন্তসেন (ঘ) বীরসেন।

২। সেনদের আদি নিবাস কোথায়?
(ক) উত্তরবঙ্গে (খ) পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে
(গ) দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট দেশে (ঘ) উত্তর ভারতের কান্যকুব্জে।

৩। দেওপাড়া প্রশস্তির রচয়িতা কে?
(ক) সন্ধ্যাকর নন্দী (খ) শ্রীধর দাস
(গ) হরিষেণ (ঘ) উমাপতিধর।

৪। নান্যদেব কোন্ অঞ্চলের রাজা?
(ক) মিথিলা (খ) উড়িষ্যা
(গ) কোটাটবীর (ঘ) কলিঙ্গ।

৫। 'বিদ্বানমন্ডলীর চক্রবর্তী' কে ছিলেন?
(ক) বল্লালসেন (খ) লক্ষণসেন
(গ) বিজয়সেন (ঘ) হেমন্তসেন।

৬। 'ঐন্দ্রিমহাশান্তিযজ্ঞ' অর্থ কী?
(ক) সুখ-শান্তির নিমিত্তে যজ্ঞ (খ) আসন্ন বিপদ থেকে মুক্তির জন্য যজ্ঞ
(গ) রাজার দীর্ঘায়ু কামনার জন্য যজ্ঞ (ঘ) রাজ্যের সীমানা নির্ধারণের জন্য যজ্ঞ।

৭। লক্ষণসেনের প্রধানমন্ত্রী ও ধর্মাধ্যক্ষ ছিলেন কোন্ পন্ডিত?
(ক) জয়দেব (খ) শরণ
(গ) উমাপতিধর (ঘ) হলায়ূধ।

৮। 'আর্যসপ্তশতী' রচয়িতা কে?
(ক) গোবর্ধন (খ) ধোয়ী
(গ) শরণ (ঘ) শ্রীধরদাস।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। সেন বংশের পরিচয় দিন।
২। বিজয়সেন কে ছিলেন?
৩। 'গৌড়েশ্বর' কাকে ও কেন বলা হয়?
৪। 'যবনান্বয়-প্রলয়-কালরুদ্র' কাকে, কেন বলা হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। সেনদের আদি পরিচয় দিন। সেন ইতিহাসের উৎস কি কি? সেন শাসকদের বংশতালিকা প্রণয়ন করুন।

২। দেওপাড়া প্রশস্তির আলোকে বিজয়সেনের কৃতিত্ব নিরূপণ করুন। কেন তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ সেন শাসক বলা হয়?

৩। বল্লালসেন ও লক্ষণসেনের আমলে বাংলার সেন বংশের ইতিহাস মূল্যায়ন করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। R.C. Majumdar, *History of Ancient Bengal.*

২। A.M. Chowdhury, *Dynastic History of Bengal.*

৩। আবদুল মমিন চৌধুরী ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস।*

৪। রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ।*

৫। নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব।*

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ

পাঠ : ১ ১। (ঘ) ; ২। (ক) ; ৩। (ঘ) ; ৪। (গ) ; ৫। (খ) ; ৬। (ক) ; ৭। (খ) ; ৮। (খ) ; ৯। (গ)।

পাঠ : ৪ ১। (খ) ; ২। (ঘ) ; ৩। (ক) ; ৪। (গ) ; ৫। ঘ

পাঠ : ৩ ১। (গ) ; ২। (গ) ; ৩। (ঘ) ; ৪। (খ) ; ৫। (গ)।

পাঠ : ৪ ১। (ক) ; ২। (খ) ; ৩। (গ) ; ৪। (ঘ) ; ৫। (ক) ; ৬। (ক) ; ৭। (গ)।

পাঠ : ৫ ১। (খ) ; ২। (ক) ; ৩। (খ) ; ৪। (গ) ; ৫। (ক) ; ৬। (গ) ; ৭। (খ)।

পাঠ : ৬ ১। (খ) ; ২। (গ) ; ৩। (ঘ) ; ৪। (ক) ; ৫। (ক) ; ৬। (খ) ; ৭। (ঘ) ; ৮। (ক)।